গবেষণাপত্র সংকলন-২১

হাফিয ইবনু হাজার আল 'আসকালানী (রহ) জীবন ও কর্ম

ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

গবেষণাপত্র সংকলন-২১

হাফিয ইবনু হাজার আল 'আসকালানী (রহ.) ঃ জীবন ও কর্ম

ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, ফ্যাক্স : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এণ্ড সার্কুলেশন :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

প্রকাশকাল : রজব, ১৪৩৪
জ্যৈষ্ঠ, ১৪২০
মে, ২০১৩

ISBN : 984-843-029-0 set

প্রচ্ছদ : গোলাম মাওলা

মুদ্রণ : আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য : সত্তর টাকা মাত্র

Gobesanapatra Sankalan-21 Written by Dr Muhammad Abdus Samad and Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition May-2013 Price Taka 70.00 only

প্রারম্ভিক কথা

২৭ জানুয়ারী, ২০১১ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত একটি স্টাডি সেশনে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম (ঢাকা ক্যাম্পাস)-এর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ **"হাফিয ইবনু হাজার আল আস কালানী ঃ জীবন ও কর্ম"** শীর্ষক একটি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন।

গবেষণাপত্রটির উৎকর্ষ বিধানের লক্ষ্যে মূল্যবান পরামর্শ সম্বলিত বক্তব্য রাখেন ড. মুহাম্মাদ আবদুল মা'বুদ, ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন, ড. মুহাম্মাদ নজীবুর রহমান, ড. মুহাম্মাদ ছামিউল হক ফারুকী, ড.মুহাম্মাদ মতিউল ইসলাম, ড. মুহাম্মাদ ছাইদুল হক, ড. মুহাম্মাদ শফিউল আলম ভূঁইয়া, অধ্যক্ষ এ.কিউ.এম. আবদুল হাকীম, অধ্যাপক আ.ন.ম. রফিকুর রহমান, জনাব মুহাম্মাদ শাফী উদ্দীন, ড. মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, ড. আ.ছ.ম. তরিকুল ইসলাম, ড. যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক, মুফতী মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান, জনাব মুহাম্মাদ আতহার উদ্দীন ও মাওলানা কামরুল হাসান। বিজ্ঞ আলোচকদের পরামর্শের ভিত্তিতে ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ তাঁর গবেষণাপত্রটিকে আরো সমৃদ্ধ করেন।

আমরা গবেষণাপত্রটি প্রকাশের সুযোগ পেয়ে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের শুকরিয়া আদায় করছি।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন!

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ أَجْمَعِيْنَ ، وَ مَنِ اهْتَدَى بِهَدْيِهٖ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ . أَمَّا بَعْدُ :

ভূমিকা ঃ

'আলিমগণ হলেন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আলোর পথ প্রদর্শক। তাঁরা জাতির চিন্তাশীল বিবেক। জাতির মশাল। এ আলোর মাধ্যমে মানুষ অন্ধকারে পথ খুঁজে নেয়। তাঁদের দিব্য জ্ঞান দ্বারা মানুষ ভাল মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করে। তাঁদের হাত ধরেই মানুষ সরল সঠিক পথে চলার সুযোগ পায়। এ বিবেচনায় মুসলিম জাতির নেতৃবৃন্দ ইসলামের ইতিহাসের উষালগ্ন থেকেই 'আলিমদের গুরুত্ব, মর্যাদা এবং তাঁদের মাধ্যমে মুসলিম জাতির জীবন ও কার্যক্রম গতিশীল রাখার প্রয়োজনকে তীব্রভাবে অনুভব করেছেন। ফলে উম্মাতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী- গুণীদের বর্ণাঢ্য জীবনী ও কর্ম তুলে ধরে ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থ রচনা করেছেন। রচিত হয়েছে নবী ও রাসূলদের ('আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম) জীবনী, সাহাবীদের জীবনী, খালীফাদের জীবনী ও 'আলিমদের জীবনী। লিখিত হয়েছে মুহাদ্দিছ, মুফাসসির, ফিকহবিদ, কবি-সাহিত্যিক ও ব্যাকরণশাস্ত্রবিদগণের জীবনালেখ্য। আলোচিত হয়েছে তাঁদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, গুণাগুণ, কর্ম, আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র, লেন-দেন, উপদেশ ইত্যাদি বিষয়। এ সব মহৎ ব্যক্তির জীবনী পাঠ করার মাধ্যমে অধ্যয়নকারীগণ অনায়াসেই তাঁদের জীবনের সাথে নিজেদের জীবনকে মিলিয়ে নেয়ার প্রয়াস পায়। তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর সুযোগ পায় ।

বস্তুতঃ ইমাম হাফিয ইবনু হাজার জ্ঞানী, গুণী ও মহৎ ব্যক্তিদের অন্যতম, যাঁদের জীবন ও কর্মে মানুষের জন্যে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে। তিনি নিজের মধ্যে ব্যাপক জ্ঞান ও পর্যাপ্ত 'ইলম সঞ্চয় করেছিলেন। অপরদিকে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে; কাজ-কর্ম, 'ইবাদাত-বন্দেগী, আল্লাহ ভীতি, সুন্দর আচরণ ও উন্নত মু'আমালাতের মাধ্যমে তা ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর অর্জিত বিশাল জ্ঞানকে নিয়ে তিনি কবরে চলে যাননি, বরং বিশাল রচনার মাধ্যমে তিনি তা মানুষের জন্যে রেখে গেছেন। ইসলামের ইতিহাসের জঘন্যতম অধ্যায় তাতারদের হাতে ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জ্ঞানভাণ্ডার ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ার পর তিনি ইসলামী জ্ঞান ও ঐতিহ্যের দিগন্তকে নতুন করে উন্মোচন ও

প্রশস্ত করেছেন। 'ইলমের সকল উল্লেখযোগ্য বিভাগে তাঁর জ্ঞানের স্বাক্ষর রেখেছেন। বিশেষ করে হাদীছে নববীর বিস্ময়কর খেদমত তাঁর যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত সর্বজন স্বীকৃত ও প্রশংসিত। তাই তাঁর বর্ণাঢ্য জীবন ও কর্ম তুলে ধরে অনেকেই গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁদের অন্যতম হলেন ইবনু হাজারের বিশিষ্ট ছাত্র হাফিয শামস উদ্দীন আস্‌সাখাভী (মৃ. ৯০২ হি.)। তিনি তার মহান শিক্ষকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে তাঁর জীবনীর উপর এক অনন্য গ্রন্থ রচনা করেন। যার শিরোনাম হলোঃ "আল জাওয়াহিরু ওয়াদ দুরার ফী তারজুমাতি শায়খিল ইসলাম ইবনি হাজার", (الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر)[১]।

তাছাড়া বর্তমান সময়েও সিরিয়ার একজন গবেষক আব্দুস সাত্তার আশ্‌শায়খ ইবনু হাজারের জীবনীর উপর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্য সমৃদ্ধ বই লেখেছেন। বইটির শিরোনাম হলোঃ "আল হাফিয ইবনু হাজার আল 'আসকালানী আমীরুল মুমিনীনা ফিল হাদীছ" (الحافظ ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث)[২]।

আমার জানা মতে বাংলা ভাষায় ইবনু হাজারের জীবনী ও কর্মের উপর কোন লেখা প্রকাশিত হয়নি। মূলতঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সম্মানিত পরিচালকের পরামর্শেই ইসলামের ইতিহাসের এক অনন্য জ্ঞান ভান্ডার হাফিয ইবনু হাজার আল 'আসকালানীর জীবন ও কর্মের উপর বাংলা ভাষায় এ লেখাটি তৈরী করতে প্রয়াসী হই। এ লেখাটি সাধারণভাবে সকল পাঠকের, বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট গবেষকদের জ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত্রে কিছুটা সহায়ক হবে, সেটিই আমাদের প্রত্যাশা। আল্লাহ তা'আলা এ কর্মটিকে কবুল করুন। আমীন!!!

১. ইবনু হাজারের সমকালীন অবস্থা ঃ

ক. রাজনৈতিক অবস্থাঃ হাফিয ইবনু হাজারের জীবনী থেকে জানা যায় যে, তাঁর জীবনকাল ছিল হিজরী ৮ম শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে ৯ম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত। এই সময়ে মিসর 'মামলুকদের' শাসনাধীন ছিল। ইসলামের ইতিহাসের সোনালী যুগ বলে খ্যাত আয়ূবী রাষ্ট্রের শাসকবর্গ শত্রুদের মুকাবিলায় নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে শ্বেত বর্ণের দাস ক্রয় করেন। তাদেরকে নানা শিক্ষা প্রশিক্ষণ

---

(১) কিতাবটি এক খন্ডে প্রকাশিত, সম্পাদনা করেছেন ড. হামিদ 'আব্দুল হামীদ ও ড. ত্বয়াহা আয যাইনী, মিসরের ইসলামী বিষয়ক উচ্চ পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত, কায়রো।

(২) বইটি এক খন্ডে প্রকাশিত, দামেশক, দারুল কলম, প্রথম সংস্করণ ১৯৯২।

দিয়ে যোগ্য করে গড়ে তোলেন। এ ক্ষেত্রে আয়ূবী শাসক সালিহ্ নাজমুদ্দীন আয়ূব কতিপয় এমন দক্ষ তুর্কী দাস ক্রয় করেন যা ইতোপূর্বে কেউ ক্রয় করার সুযোগ পায়নি। এ সব দাসকে তিনি সৈন্যবাহিনীতে পাঠান। ফলে এক পর্যায়ে তার অধিকাংশ সেনা সদস্য ছিল এই ক্রীতদাসগণ[৩]। সত্যি কথা বলতে কি এই 'মামলূক বা মামালীক' বলে খ্যাত ক্রীতদাসরাই অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে বিশাল শক্তি অর্জন করেন এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ক্রীতদাসরা দুভাগে বিভক্ত ছিলঃ এক. নেভাল ক্রীতদাস, দুই. জারাক্স ক্রীতদাস। বাদশাহ্ সালিহ্ নাজমুদ্দীন আয়ূব নেভাল ক্রীতদাসদেরকে নীল সাগরের নিকটবর্তী সামরিক ঘাঁটিতে থাকতে দেন এবং তাদেরকে উন্নত সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়ায় তাঁরা দুর্দান্ত সামরিক শক্তি সঞ্চয় করে। ফলে নিজের ক্ষমতা ও দেশকে সুসংহত করার লক্ষ্যে বাদশাহ্ নাজমুদ্দীন তাদেরকে ক্ষমতায় ভাগ দেন। তারা তাদের দক্ষ সমারিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ফ্রান্সের বাদশাহ্ লুইয়াস আততাসি'কে বন্দী করেন (৬৪৭ হি.) এবং তাতারদের ক্ষমতা খর্ব করে নিজেদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করেন। এ ভাবে তারা প্রায় এক শত ত্রিশ বছর (৬৪৮ হি./১২৫০ ঈ. থেকে ৭৮৪ হি./ ১৩৮১ ঈ.) শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারা তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করতে করতে মরোক্ক পর্যন্ত পৌঁছে যান। এই দলের সর্বশেষ সুলতান ছিল 'আমীর হাজী'। তিনি ১৩৮১ ঈ. সনে ১১ বছর বয়সে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। কিন্তু তার পক্ষে শক্তিশালী গভর্নর 'বারকুক আল জারাক্সী' রাষ্ট্রের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেন। দেড় বছরের মাথায় তিনি সুলতান 'আমীর হাজীকে' ক্ষমতাচ্যুত করে নিজেকে শাসক বলে ঘোষণা করেন এবং 'আযযাহির' উপাধি গ্রহণ করেন[৪]।

দুই. জারাক্স ক্রীতদাসগণ নেভাল ক্রীতদাসদের মতো পারিবারিক তন্ত্রে বিশ্বাসী ছিল না বলে ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রে নানা ধরনের অস্থিরতা ও গোলযোগ দেখা দেয়। কিন্তু তারা অভ্যন্তরীণভাবে তা প্রতিহত করতে সক্ষম হন এবং রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সমর্থ হয়। ফলে বিদেশী শক্তির পক্ষে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানো আর সম্ভব হয় না। এ ভাবে এ ক্রীতদাসগণ নিজেদের সামরিক শক্তি ও দক্ষতার মাধ্যমে বিশাল সামরিক শক্তিধর তৈমুরলংকে পর্যন্ত পর্যদুস্ত করতে সক্ষম হয়। যিনি এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম অঞ্চলের প্রায় সবগুলো দেশকেই পরাভূত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সে যাই হোক, জারাক্স ক্রীতদাসগণও প্রায় এক শত চৌত্রিশ বছর (৭৮৪ হি. – ৯২৩ হি./১৩৮২ ঈ –

---

(৩) সাঈদ 'আব্দুল ফাত্তাহ 'আশুর, মিসর ওয়াশ্ শাম ফী 'আসরিল আয়ূবিয়্যীনা ওয়াল মামালীক, (বৈরুতঃ দারুন নাহযাতিল 'আরাবিয়্যাহ), পৃ. ১৬৫ – ১৬৯।

(৪) প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১ – ২৪৭।

১৫১৭ ঈ.) অতি দক্ষতার সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। এভাবে মামালীকগণ প্রায় পৌনে তিন শত বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন[৫]। মামালীক শাসনের অবসানের অব্যবহিত পরেই মিসর উছমানীয় খিলাফাতের পতাকাতলে চলে আসে।

খ. সামাজিক অবস্থা ঃ মামালীক সুলতানদের আমলে মিসরের জীবনযাত্রা অত্যন্ত গতিশীল ছিল। সার্বিক ক্ষেত্রেই মানুষের সুখ শান্তি, কর্ম উদ্দীপনা ও প্রাণ চাঞ্চল্যতায় ভরপূর ছিল। সমাজে 'আকীদাহ–বিশ্বাস, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জীবনাচরণ সর্ব ক্ষেত্রেই ইসলামি রীতি–নীতির ব্যাপক প্রচলন ছিল। আল্লাহ তা'আলার বিধান অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত হতো। জনগণের সুযোগ সুবিধার লক্ষ্যে সমাজ কল্যাণ ও জন কল্যাণমূলক পর্যাপ্ত কার্যক্রম তারা গ্রহণ করেছিলেন। এ সময়ে তারা দীন ইসলাম ও ইসলামী শারী'য়াতের ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন, 'আলিমদেরকে সম্মান দেন এবং মাসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। এতদসত্ত্বেও 'মামালীকদের' শাসনামলে শ্রেণী বৈষম্যের ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। ফলে যুলম নির্যাতন, বঞ্চনার শিকার থেকে জনগণ মুক্ত ছিল না। সমাজের জনগণ কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। যথাঃ (১) সমাজের উচ্চ শ্রেণী। তারা ছিল মামালীক শাসকবর্গ। রাষ্ট্রের অধিকাংশ সুযোগ সুবিধা তারা ভোগ করতো। (২) 'আলিম, বিচারক এবং মাসজিদের ইমাম ও মাদরাসার শিক্ষকগণ। শাসক গোষ্ঠীর নিকট এ শ্রেণীর লোকদের যথেষ্ট কদর ও সম্মান ছিল। (৩) ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ, যারা নিজেদের যোগ্যতা বলে সুখে শান্তিতে ও প্রাচুর্যের মধ্যে বসবাস করতেন। কোন প্রকার যুলম ও বৈষম্যের শিকার তাদেরকে হতে হতো না। (৪) সাধারণ জনগণ, যারা ছিল কৃষক এবং বিভিন্ন পেশার সাথে সম্পৃক্ত। দুঃখ, কষ্ট ও বঞ্চনার শিকার হয়েই তারা জীবন যাপন করতো[৬]।

গ. অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ মামালীক সুলতানদের আমলে কৃষি কার্যক্রম ব্যাপক গুরুত্ব পায়। এ জন্যে অনেক ব্রীজ, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়। এমনকি সুলতান নাসির মুহাম্মাদ বিন কালাউন নিজেই এগুলোর নির্মাণ কাজের তত্ত্বাবধান করতেন। ফলে কৃষিজাত পণ্যের ব্যাপক উৎপাদন হয়। এতদসত্ত্বেও উৎপন্নকারী কৃষকগণ অভাব অনটন এবং চরম বঞ্চনার মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করতেন। কৃষির উন্নতির মতোই শিল্প খাতেরও ব্যাপক উন্নতি হয়। যেমনঃ উন্নত মানের সিল্ক, পশমী, কাতান এবং সুতার কাপড় উৎপাদন হয়। তাছাড়াও খনিজ শিল্প,

---

(৫) প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮ – ২৪৯।

(৬) প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮ – ২৯০; ইবনু হাজর, তাগলীকুত তা'লীক এর সম্পাদকের ভূমিকা, ১/৩৪ – ৩৫।

কাঠ শিল্প এবং সিরামিক শিল্পেরও ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। তবে ব্যবসায়ীদের হাতেই মূলত অর্থনীতির চাবিকাঠি ছিল। এ সময়ে দেশীয় ব্যবসা–বাণিজ্যের উন্নতির সাথে সাথে বড় বড় আন্তর্জাতিক মার্কেটও গড়ে উঠে। সর্বাবস্থায় দ্রব্যমূল্য, ওযন এবং পণ্যের গুণগত মান নিয়ে যাতে করে কেউ ইচ্ছেমতো কিছু করতে না পারে সে জন্যে সার্বক্ষণিক তদারকি করা হতো। তবে জারাক্স মামালীকদের সময় ব্যবসা বাণিজ্যের দিগন্ত কিছুটা সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল, ফলে মিসরের কেন্দ্রীয় ব্যবসা নিম্নমুখী হয়ে পড়ে[৭]।

ঘ. শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ঃ 'মামালীক" শাসনামলে মিসর ও সিরিয়া অঞ্চলে জ্ঞান চর্চার ব্যাপক প্রসার ঘটে। এ সময়ে মুসলিমরা অনেক বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। সেখান থেকে বহু সংখ্যক জ্ঞানী-গুণী ও বিদ্বান ব্যক্তি বের হন। তাঁরা শিক্ষা জগতে বিশাল অবদান রাখেন এবং শিক্ষার উপকরণ হিসেবে বিশাল গ্রন্থ ভান্ডার রচনা করেন। এর কারণ স্বরূপ দুটো বিষয়কে উল্লেখ করা যায়।

১. বাগদাদের পতন এবং ক্রুসেডদের হাতে স্পেনের চরম দুরবস্থার ফলে জ্ঞানী–গুণী ও 'আলিমগণ নিরাপদ স্থান হিসেবে মিসরকে বেছে নেন। ফলে মিসর জ্ঞানী–গুণী ও সম্ভ্রান্ত লোকদের আবাসভূমি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

২. হালাকু খানের নেতৃত্বে তাতারদের দ্বারা ইসলামের জ্ঞান ভান্ডার বাগদাদের বিশাল লাইব্রেরী ও গ্রন্থাগারগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ার ফলে জ্ঞানের জগতে মুসলিমদের যে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়, এ তীব্র অনুভূতি জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে অপরিহার্য কর্তব্যবোধ সৃষ্টি করে। যার ফলে তাঁরা ইসলামী শারী'য়াতের উৎস ও অনন্য গ্রন্থগুলোর শূন্যস্থান পূরণের লক্ষ্যে প্রচুর লেখালেখি ও গ্রন্থ রচনার কর্ম শুরু করেন। ব্যাপক এ শিক্ষা আন্দোলনে মামালীকগণও অংশগ্রহণ করেন। এ আমলে বিভিন্ন মাদ্রাসা, মাসজিদ ভিত্তিক গণ গ্রন্থাগার এবং ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের ফলে শিক্ষার ব্যাপক উন্নতি ঘটে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

১. আযযাহিরিয়্যাতুল ক্বাদীমাহ মাদরাসা (المدرسة الظاهرية القديمة)। ৬৬২ হি. সনে এ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে 'ইলমুল ক্বিরাআত, হাদীছ সহ হানাফী ও শাফি'ঈ ফিক্হ পড়ানো হতো।

---

(৭) মিসর ওয়াশ্ শাম ফী 'আসরিল আয়ূবিয়্যীনা ওয়াল মামালিক, পৃ. ২৮৩ – ২৮৮; আব্দুস সাত্তার, ভূমিকা 'হাফিয ইবনু হাজার আল 'আসকালানী আমীরুল মু'মিনীনা ফিল হাদীছ, পৃ. ১৭।

২. আলমানসূরিয়্যা মাদরাসা (المدرسة المنصورية)। এটি ৬৭৯ হি. সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাফসীর, হাদীছ এবং চিকিৎসা বিষয়ক লেখা পড়াসহ প্রসিদ্ধ চারটি মাযহাবের ফিকহ এখানে পড়ানো হতো ।

৩. আননাসিরিয়াহ মাদরাসা (المدرسة الناصرية)। হিজরী ৭০২ সনে এ মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪. আস্সাহিবিয়্যাতুল বাহাইয়্যাহ মাদরাসা (المدرسة الصاحبية البهائية)। মিসরে অবস্থিত 'আমর ইবনুল 'আস জামে' মাসজিদের পার্শে এ মাদরাসাটি স্থাপিত হয় ৬৫৪ হিজরী সনে। এটি বিশ্ব বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত।

৫. আলজামালিয়াহ মাদরাসা (المدرسة الجمالية)। এ মাদরাসাটি ৭৩০ হি. সনে কায়রোতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

একইভাবে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়েও ফিক্হ, হাদীছ, তাফছীর, নাহু ইত্যাদি বিষয় পড়ানো হতো। তাছাড়া সেখানে ইসলামী আলোচনা অনুষ্ঠান সহ অন্যান্য বিষয় নিয়েও প্রচুর গবেষণা হতো। বিভিন্ন জামে' মাসজিদেও ইসলামের নানা বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হতো।

অপরদিকে সিরিয়াতেও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। তন্মধ্যে নাসিরিয়াহ মাদরাসা, 'আদিলিয়াহ মাদরাসা, আশরাফিয়া মাদরাসা, 'আমরিয়া মাদরাসা বিশিষ্টতা লাভ করেছিলো। দামেস্কের উমাইয়া জামে' মাসজিদে কুরআন শিক্ষার ৭৩টি নিয়মিত আসর বসতো। তাছাড়া হাদীছ ও ফিক্হ বিষয়ক অনেক গবেষণামূলক পড়ালেখা হতো।

অন্যদিকে এই সময় ইতিহাস শাস্ত্রেও অনেক বিজ্ঞ ও খ্যাতিমান ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের মধ্যে ছিলেনঃ আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইবনু 'আলী (মৃ. ৭৩২ হি.), ইমাম হাফিয আয্ যাহাবী (মৃ. ৭৪৮ হি.), হাফিয ইবনু কাছীর (মৃ. ৭৭৪ হি.), ইবনু খালদুন (মৃ. ৮০৮ হি.), আল মাক্বরীযী (মৃ. ৮৪৫ হি.) এবং ইবনু তাগরী বারদী (মৃ. ৮৭৪ হি.) ।

বস্তুতঃ শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও উন্নতির এই সোনালী যুগে হাফিয ইবনু হাজার জন্মগ্রহণ করেন এবং ইসলামী শিক্ষা দীক্ষার মাধ্যমে নিজেকে সমকালীন সময়েই শুধু নয় বরং তৎপরবর্তী সর্বযুগেই বিশ্ব বিখ্যাত বরেণ্য 'আলিম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন[৮]।

---

(৮) হাফিয আস সুয়ূতী, হুসনুল মুহাযারাহ, ২/২৫৭; তাগলীকুত তা'লীক, ১/৩৫- ৪৩; হাফিয ইবনু হাজার আল 'আসকালানী আমীরুল মুমিনীনা ফিল হাদীছ, পৃঃ ১৯- ২৬।

২. ইবনু হাজারের জীবন পরিক্রমা ঃ

ইবনু হাজারের নাম ও বংশ ঃ

শায়খুল ইসলাম, হাফিয, প্রধান বিচারক, শিহাব উদ্দীন আবুল ফযল আহমাদ বিন 'আলী বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন 'আলী বিন মাহমুদ বিন আহমাদ বিন আহমাদ আল কিনানী আল 'আসক্বালানী, আল মিসরী আশ্ শাফি'ঈ। 'আসকালান ফিলিস্তিনের একটি শহর। এ শহরেই তাঁর পিতৃ পুরুষগণ বসবাস করতেন। তবে তিনি মিসরে জন্মগ্রহণ করেন।

ইবনু হাজার ঃ

এটি একটি নাম না কোন উপাধি তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কারো মতে এটি তাঁর বংশের উর্ধ পুরুষ আহমাদ নামক একজন ব্যক্তির উপাধি। কারো কারো মতে এটি উল্লেখিত আহমাদ নামক ব্যক্তির পিতার নাম। তবে ইবনু হাজারের ছাত্র ও তাঁর জীবনীকার হাফিয শামস উদ্দীন আস্‌সাখাভীর (মৃ. ৯০২ হি.) মতে 'ইবনু হাজার' তাঁর পূর্ব পূরুষের কোন এক ব্যক্তির উপাধি ছিল[৯]।

ইবনু হাজার শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান ঃ

ইবনু হাজার বংশানুক্রমিক ভাবেই জ্ঞান, মর্যাদা, নৈতিকতা ও চরিত্র অর্জন করেছেন। এ রকম বংশে জন্ম গ্রহণের কারণেই তিনি শিক্ষার মশাল হাতে নিয়ে শিক্ষার পথে পা বাড়ান। তাঁর বংশের শিক্ষা-দীক্ষা, মান-মর্যাদা, নেতৃত্ব, দান দক্ষিণা, নীতি-নৈতিকতা এবং উন্নত চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁর জীবনীকারগণ তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন [১০]।

ইবনু হাজারের পিতার চাচা ফখরুদ্দীন 'উছমান বিন মুহাম্মাদ আল কিনানী আশ শাফি'ঈ (মৃ. ৭১৪ হি.), যিনি ইবনু বায্‌যার নামে খ্যাত। তিনি মিসরের ইসকান্দারিয়ায় বসবাস করেন এবং শাফি'ঈ মাযহাবের ফাতওয়া বিভাগের প্রধান ছিলেন। তার দুই ছেলেও প্রসিদ্ধ ফকীহ্ ছিলেন।

ইবনু হাজারের দাদা কুতুব উদ্দীন মুহাম্মাদ বিন নাসীর উদ্দীন (মৃ. ৭৪১ হি.)। তিনিও একজন প্রসিদ্ধ 'আলিমে দ্বীন ছিলেন। তৎকালীন সময়ের অনেক বড় বড় শায়খদের নিকট থেকে তিনি জ্ঞান লাভ করেন।

ইবনু হাজারের পিতা নূর উদ্দীন 'আলী বিন মুহাম্মাদ বিন মাহমুদ আহমাদ বিন হাজার (মৃ. ৭৭৭ হি.) প্রসিদ্ধ শায়খদের নিকট থেকে 'ইলম' অর্জন করেন। তিনি

---

(৯) আস সাখাভী, আল জাওয়াহির ওয়াদ দুরার, পৃঃ ৫৫.

(১০) মুহাম্মাদ 'আব্দুর রহমান, ফাতহুল মান্নান বিমুক্বাদ্দিমাতি লিসানিল মীযান, (বৈরুতঃ দার ইহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, ২য় সংস্করণ, ২০০১ঈ), পৃঃ ২২ – ২৪।

জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা কার্যক্রম নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকতেন। তাই আরবী ভাষা, সাহিত্য, ও ফিকহ্ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি বিচারের দায়িত্বও পালন করেছেন। তাছাড়া তিনি ভাল কবিতা লিখতে পারতেন। কবিতার উপর তাঁর কিছু বই আছে। তন্মধ্যে 'দিওয়ানুল হারাম' উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রশস্ত জ্ঞান, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, দীনদারী, আমানতদারী, উন্নত চরিত্র ও সৎ মানুষের প্রতি মহব্বত ইত্যাদি গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। কুরআন কারীমের হিফয সহ বেশ কিছু কিতাবেরও তিনি হাফিয ছিলেন। তাছাড়া তিনি ফাতওয়া ও সাত কিরাতের উপর সনদপ্রাপ্ত ছিলেন। বিদ্যা চর্চার সাথে সাথে তিনি একজন আমানাতদার ও আল্লাহভীরু ব্যবসায়ী ছিলেন। অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি তাঁর ভূয়সী প্রশংসা কারেছেন[১১]।

জন্ম ও বাল্যকাল ঃ

ইবনু হাজারের পিতা নূর উদ্দীন নিজার বিন্ত আবু বাকর আয্ যিফতাবী নামক এক অকুমারী মেয়েকে বিয়ে করেন। তাঁর গর্ভে 'ছিত্তুর রিকাব' নামের এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাঁর তিন বছর পর ইবনু হাজর ৭৭৩ হিজরী সনে জন্ম লাভ করেন। তাঁর জন্মের অল্প কিছু দিন পর মা মৃত্যুবরণ করেন। এমনকি তাঁর পিতাও তাঁর চার বছর এবং তাঁর বোনের সাত বছর বয়সের সময় তাদেরকে ইয়াতীম করে পরলোক গমন করেন। এভাবেই তাঁরা দু ভাই-বোন ইয়াতীম হিসেবে জীবন যাপন শুরু করেন।

ইবনু হাজারের পিতা অল্প যে কয়দিনই জীবিত ছিলেন তাঁদেরকে উত্তম শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি উভয় ভাই বোনকে নিয়ে শিক্ষা বৈঠকগুলোতে হাযির হতেন এবং বড় বড় 'আলিমদের নিকট থেকে বিদ্যা গ্রহণের ব্যবস্থা করেন। তিনি তাঁদেরকে (ভাই বোন) সঙ্গে নিয়ে হাজ্জেও গিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি তাঁদের উত্তম জীবন যাপনের জন্যে প্রয়োজনীয় সম্পদও রেখে গিয়েছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর ইবনু হাজারের বোন 'ছিত্তুর রিকাব'ছাট ভাইকে মায়ের আদর ও যত্ন দিয়ে লালন পালন করেন। এ প্রসঙ্গে ইবনু হাজার নিজেই বলেন ঃ "আমার বোন একজন কারীআহ, লেখিকা ও অসাধারণ মেধাসম্পন্না ছিলেন। আমার মায়ের মৃত্যুর পর তিনিই আমার মা ছিলেন। ৮৫০ হিজরী সনে তাঁর মৃত্যু হয়"[১২]।

---

(১১) ইবনু হাজার, আল মাজমা'উল মুআছছিছ, সম্পাদনা ড. ইউসুফ মুরা'শালী, (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯৩ঈ), ৩/১৯৬ - ১৯৭।

(১২) প্রাগুক্ত, ৩/৩০২)

ইবনু হাজারের সহধর্মিনী ঃ

(১) ইবনু হাজারের বয়স যখন ২৫ বছর তখন তিনি উনস বিন্‌ত কারীম উদ্দীন 'আব্দুল কারীম বিন আহমাদ বিন 'আব্দুল 'আযীযকে ৭৯৮ হিজরীর শা'বান মাসে বিয়ে করেন। তাঁর গর্ভে ৫টি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তারা হলোঃ যাইন খাতুন, ফারহাহ, গালিয়াহ, রাবি'আহ এবং ফাতিমাহ। তাঁর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁর সব সন্তানই তাঁর চোখের সামনে মৃত্যুবরণ করে। মা হয়ে তিনি উত্তম ধৈর্য ধারণ করেন এবং আল্লাহর নিকট প্রতিদানের প্রত্যাশা নিয়ে ৮৬৭ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন।

ইবনু হাজার তাঁর স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত আন্তরিক ছিলেন। তাঁর শায়খ আয্ যাইন আল 'ইরাকীর নিকট থেকে তাঁর স্ত্রীকে ধারাবাহিক হাদীছ শোনান এবং তাঁর জন্যে সনদের ব্যবস্থা করেন। তিনি ৮১৫ হিজরী সনে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে হাজ্জ করতে যান। তাঁর স্ত্রী কিরাআত শাস্ত্রে বিশেষ দক্ষ ছিলেন বলে অনেক শিক্ষার্থী তাঁর নিকট থেকে 'ইলমুল কিরাআত শিখেন ।

(২) তারপর তিনি ৮০৪ হিজরী সনে আয্ যাইন আবু বকর আমশাতী নামক এক ব্যক্তির বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করেন। তাঁর গর্ভে আমিনাহ নামক এক কন্যা সন্তান জন্ম নেয়। তবে মেয়েটি বেশি দিন জীবিত ছিল না। ৮৩৬ হিজরীতে মেয়েটি মারা যাবার পর ইবনু হাজার 'আমিদ' অঞ্চলে চলে যান। যাবার সময় তিনি তাঁর এই স্ত্রীকে তালাক দেন।

(৩) ৮৩৬ হিজরী সনে তিনি লাইলা বিন্‌ত মাহমুদ বিন তাও'আন আলহালাবিয়্যাহকে বিয়ে করেন। ইবনু হাজার সিরিয়ার হালাবে থাকা অবস্থায় এই স্ত্রীর সাথেই ছিলেন। কিন্তু হালাব ত্যাগ করার সময় ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণে তিনি তাকে সাথে নিতে পারেননি। ৮৮১ হিজরী সনে প্রায় ৮০ বছর বয়সে ঐ মহিলার মৃত্যু হয়।

(৪) ইবনু হাজারের কোন পুত্র সন্তান না থাকায় তিনি পুত্রের জন্যে খুবই আকাঙ্খিত ছিলেন এ জন্যে যে, ছেলে তাঁর 'ইলমের উত্তরাধিকারী হবে এবং হাজার বংশের মধ্যে জ্ঞান চর্চার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থাকবে। তাঁর স্ত্রীর 'খাস তুরক' নামক এক দাসী ছিল। স্ত্রী দাসীটিকে বিক্রয় করলে ইবনু হাজার কৌশলে শায়খ শামস উদ্দীনের মাধ্যমে তাঁকে ক্রয় করেন। এই ক্রীতদাসীর গর্ভেই ইবনু হাজারের একমাত্র পুত্র সন্তান কাজী বদর উদ্দীন আবুল মা'আলী মুহাম্মাদ জন্ম গ্রহণ করেন। এ সব কিছুই তাঁর স্ত্রীর নিকট গোপন ছিল; যাতে করে তিনি মনে

কষ্ট না পান। পরে অবশ্য তাঁর স্ত্রী জানতে পেরে ছেলে ও তাঁর মাকে নিজের বাড়িতে ফিরিয়ে আনেন[১৩]।

ইবনু হাজারের সন্তানাদি ঃ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইবনু হাজারকে ৬টি কন্যা সন্তান ও একটি পুত্র সন্তান দান করেছেন। তাঁরা হলেন ঃ

প্রথম কন্যা ঃ 'যাইন খাতুন'। তিনি ৮০২ হিজরী সনের রজব মাসে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ইবনু হাজার মেয়েটির প্রতি অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। তাকে লেখা পড়া শিক্ষা দেন। আমীর শাহীন আল কুরকীর সঙ্গে তার বিয়ে দেন। তার গর্ভে বেশ কয়েকজন সন্তান জন্ম লাভ করে। তন্মধ্যে আবুল মাহাসিন ইউসুফ 'সিবতি ইবনু হাজার' হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ব্যতীত অন্যান্য সকল সন্তান তাদের পিতার জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেন। ইবনু হাজারের এই কন্যা ৮৩৩ হিজরী সনে গর্ভবতী অবস্থায় প্লেগ রোগে মৃত্যুবরণ করেন।

দ্বিতীয় কন্যা ঃ ফারহাহ। তিনি হিজরী ৮০৪ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। মুহিব উদ্দীন বিন আল আশকারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। তিনি একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। তিনি মাত্র ২৩ বছর বয়সে মারা যান।

তৃতীয় কন্যা ঃ গালিয়াহ ৮০৭ হিজরীতে জন্ম লাভ করেন।

চতুর্থ কন্যা ঃ ফাতিমাহ। ৩য় ও ৪র্থ কন্যা দুজনই প্লেগ রোগে মারা যান।

পঞ্চম কন্যা ঃ রাবি'আহ ৮১১ হিজরী সনের রজব মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। শিহাব ইবনু মাকনূন নামের এক ব্যক্তির সাথে তাঁর বিয়ে হয়। তিনি একটি কন্যা সন্তান প্রসব করেন, যার নাম রাখা হয় 'গালিয়াহ'। পিতা মাতার পূর্বেই মেয়েটির মৃত্যু হয়। ৮২৯ হিজরী সনে রাবি'আর স্বামী মারা যাবার পর তাঁর বোন ফারহার (মৃঃ ৮২৮ হি.) স্বামী মুহিব আল আশকারের সঙ্গে দ্বিতীয় বিয়ে হয়। তাঁর সংসারে থাকা অবস্থায় ৮৩২ হিজরীতে তিনি মারা যান।

ষষ্ঠ কন্যা ঃ আমিনাহ। যিনি তাঁর স্ত্রী আরমালাহ যাইন আশ্ শাতিবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং শিশু বয়সেই ৮৩৬ হিজরী সনে মারা যান[১৪]।

ইবনু হাজারের পুত্র ঃ ইবনু হাজারের একমাত্র পুত্র সন্তান হলেন বদর উদ্দীন আবুল মা'আলী মুহাম্মাদ। তিনি ৮১৫ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই তিনি কুরআন কারীম মুখস্ত করেন। ৮২৬ হিজরী সনে মাত্র ১১ বছর বয়সে তখনকার প্রচলিত নিয়ম অনুসারে একটি খানকাহ্তে সালাতুত তারাবীহ পড়ানোর

---

(১৩) প্রাগুক্ত, ৩/ ১৬৭

(১৪) ইবনু হাজার, ইম্বাউল গামর বি আম্বায়িল 'উমরি, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ), ৮/১৮২

দায়িত্ব পালন করেন। তাকে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসীনের নিকট হাদীছ পড়ার ব্যবস্থা করা হয়। তিনি সনদের উপর ডিগ্রীও লাভ করেন। তাছাড়া ইবনু হাজার তাঁকে ফিকহের উপর ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্যও উৎসাহিত করেন । এ লক্ষ্যে তাঁর জন্যে একটি মূল্যবান বইও রচনা করেন। যা 'বুলূগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম' নামে প্রসিদ্ধ।

পিতার জীবদ্দশায় তাঁর ছেলে বেশ কিছুদিন চাকুরীও করেন এবং হাজ্জও সম্পন্ন করেন। তিনি তাঁর পিতার 'উসূলে হাদীছের' উপর লেখা "নুখবাতুল ফিক্‌র" কিতাবের শারহ্ লেখেন এবং নামকরণ করেন ঃ " নাতীজাতুন নযর ফী শারহি নুখবাতিল ফিক্‌র" । তিনি ৮৯৬ হিজরীতে পেটের পীড়ায় মৃত্যুবরণ করেন।[১৫]

ইবনু হাজারের পৌত্র আলী বিন আবুল মা'আলী মুহাম্মাদও জ্ঞান চর্চায় পিতা ও পিতামহের পথ অনুসরণ করেন। তাছাড়া তাঁর আরেক পৌত্র (মেয়ের ছেলে) বিখ্যাত ঐতিহাসিক, প্রসিদ্ধ ফাকীহ ও মুহাদ্দিছ আবুল মাহাসিন জামাল উদ্দীন ইউসুফ বিন শাহীন আল কারাকী উঁচু মাপের একজন 'আলিম ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি ৮৯৯ হিজরী সনের ১৬ই মুহাররম মৃত্যুবরণ করেন[১৬] ।

ইবনু হাজারের অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ

ইবনু হাজার ধনী ও সম্পদশালী পিতা মাতার সন্তান হওয়ার কারণে প্রাচুর্যের মধ্যে লালিত পালিত হয়েছেন। তাঁর পিতা ছিলেন মিসরের একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। মাতাও ছিলেন ঐশ্বর্যশালী বংশের মেয়ে। উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি অনেক সম্পদের মালিক হন এবং প্রাচুর্যময় জীবন যাপন করার সুযোগ পান। তাছাড়া নিজের লেখাপড়া এবং এ উদ্দেশ্যে দেশ বিদেশে সফরের জন্যে তাঁকে আর্থিক সংকট বা দৈন্যের সম্মুখীন হতে হয়নি। তারপর তিনি যখন উচ্চপদস্থ চাকুরী করেন এবং সম্মানজনক বেতন ভাতা লাভ করেন তখন তা থেকে তিনি জনকল্যাণমূলক কাজে অর্থ ব্যয় করেন। তাঁর দীর্ঘ সময়ের সার্বক্ষণিক সঙ্গী শিষ্য আল বিকা'য়ী বলেন ঃ "তিনি শাসক ও বন্ধুদের নিকট থেকে হাদিয়া তোহফা গ্রহণ করতেন না"[১৭] ।

তাছাড়া ইবনু হাজার যখন গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্য সমৃদ্ধ সুন্দর সুন্দর গ্রন্থ রচনা শুরু করেন এবং এগুলোর সুনাম ও গ্রহণযোগ্যতা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তখন রাজা

---

(১৫) ইবনু হাজার, আল মাজমা'উল মুআছছিছ, ১/২৪৪,৩৫৩

(১৬) আযযারকালী, খায়রুদ্দীন, আল আ'লাম, (বৈরুতঃ দারুল 'ইলমি লিল মালাঈন), ৮/২৩৪।

(১৭) ড. মুহাম্মাদ কামাল 'ইয উদ্দীন, ইবনু হাজার আল 'আসকালানী মুআররিখান, (বৈরুতঃ 'আলামুল কুতুব), পৃঃ ১০৩।

বাদশাহ্ ও সমাজের বড় বড় লোকেরা সেগুলোর বিনিময়ে তাঁকে আর্থিকভাবে সম্মানিত করেন। ফলে তিনি আর্থিকভাবে আরো স্বচ্ছল হন। তিনি এ অর্থ দিয়ে নিজের ও পরিবারের ব্যয়ভার বহন করা সহ সফর, গবেষণা, আত্মনির্ভরশীলতার পথে ব্যয় নির্বাহ করেন। ফলে তিনি একজন সম্মানিত 'আলিম হিসেবে নিজের মান মর্যাদা রক্ষা করে চলেন এবং 'ইলমী ময়দানে উত্তম আদর্শ হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন।

ইবনু হাজারের চরিত্র ও গুণাবলী ঃ ইবনু হাজারের মধ্যে উন্নত চরিত্র, অসাধারণ জ্ঞান সহ সুন্দর গঠন আকৃতি, শালীন আচার আচরণ ও সুন্দর গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছে। বিদ্যান ও 'আলিমদের মধ্যে তিনি ছিলেন উজ্জল নক্ষত্র। তাঁর সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। লোকদের আলোচনার মধ্যমণি হয়ে উঠেন তিনি। বিভিন্ন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থীগণ তাঁর নিকট আসতে থাকে। তিনি দেশ বরেণ্য 'আলিমদের প্রশংসার বস্তুতে পরিণত হন।

তিনি মধ্যম মাপের, শুভ্র বর্ণের, সুন্দর ও আকর্ষণীয় গঠনের মানুষ ছিলেন। তিনি হালকা পাতলা গড়ন ও সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। তাঁর ছোট ছোট গোঁফ, সাদা ঘন দাঁড়ি, পরিষ্কার ঝকঝকে মযবূত দাঁত, সুস্থ দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি, বিশুদ্ধ ভাষা, প্রখর মেধা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও উচ্চ আকাঙ্খা ছিল। তিনি অত্যন্ত লজ্জাশীল ছিলেন। চুপ থাকা পছন্দ করতেন। প্রয়োজন ছাড়া কথা বলতেন না। নিজের গোঁফ ও নখ নিজেই কাটতেন। সাহায্যকারী থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজেই ওযূ ও গোসলের পানি সংগ্রহ করতেন। কারো সাথে অপ্রীতিকর আচরণ করতেন না। তিনি দৃঢ় মনোবল পোষণ ও সত্য কথা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করতেন। তিনি মানুষকে বেশি বেশি সালাম দিতেন।

তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ও ধৈর্যশীল ছিলেন। সহজ সরল জীবন যাপন করতেন। খাওয়া দাওয়া ও পোশাক পরিচ্ছদে ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিধে। তিনি অমায়িক ব্যবহারের অধিকারী ছিলেন। হালাল উপার্জনের প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দানশীলও ছিলেন। বিশেষ করে শিক্ষার জন্যে অকাতরে দান করতেন। তাছাড়া গরীব, দুঃখী ও অভাবীদের মধ্যে অর্থ দান করতেন। প্রতিবেশীদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন। রামাদান মাসে মধু ও চিনি ক্রয় করে লোকদের মধ্যে বন্টন করতেন। ঈদুল ফিতর ও অন্যান্য সময় ভোজ্যতেল দান করতেন। ঈদুল আযহাতে গরীব ও অভাবীদের মাঝে কুরবানীর গোশত বিলিয়ে দিতেন। অথবা একশত দীনার পরিমাণ নগদ অর্থ দান করতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ দানগুলো গোপনেই করতেন।

ইবনু হাজার 'ইবাদাতগুযার বান্দা ছিলেন। আল কুরআন তিলাওয়াত, তাহাজ্জুদের নামায ও নফল বন্দেগী করতেন। অনেকবার হাজ্জ সম্পাদন করেছেন। শিশুকালে পিতার সাথে হাজ্জ করেন। ৮০০ হিজরী সনে ফরয হাজ্জ আদায় করেছেন। তারপর ৮০৫ হি. ও ৮১৫ হি. সনে, সর্বশেষে ৮২৪ হিজরী সনে হাজ্জ সম্পাদন করেন। তিনি খুব বেশি বেশি যিকর আযকার, তাসবীহ, তাহলীল, তাহমীদ ও ইস্তিগফার পাঠ করতেন [১৮]।

ইবনু হাজারের সুন্নাহর প্রতি গভীর ভালবাসা ঃ

ইবনু হাজার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর শিক্ষা ও সুন্নাহর একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহকে সর্বদা অগ্রাধিকার দিতেন। হাদীছের সংরক্ষণ করা ছিল তার মহান ব্রত। অপরদিকে বিদ'আতকে চরমভাবে ঘৃণা করতেন। যারা আল্লাহর হুদুদ (সীমারেখা) লংঘনকারী ছিলো তাদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। এ প্রসঙ্গে ইবনু হাজার নিজেও তাঁর কিতাব "আল কাওলুল মুসাদ্দিদ ফীয্ যাব্বি 'আন মুসনাদি আহমাদ" (القول المسدد في الذبّ عن مسند أحمد) এর ভূমিকাতে বলেন ঃ "এ কয়েকটি পৃষ্ঠাতে আমি ঐ সব হাদীছ সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই, যেগুলোকে কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি মিথ্যা ও জাল হাদীছ বলে অভিহিত করেছেন। বস্তুতঃ এ হাদীছগুলো প্রখ্যাত ইমাম আবু আবদুল্লাহ আহমাদ ইবনু হাম্বল– যিনি অতীত কাল ও বর্তমান কালেও হাদীছের ইমাম বলে খ্যাত এবং হাদীছের নিগুঢ় তত্ত্ব সম্পর্কেও অভিজ্ঞ – তাঁর প্রসিদ্ধ হাদীছগ্রন্থ 'মুসনাদে আহমাদে' সংকলন করেছেন। আমি আল্লাহর দীন ও মানুষের জন্যে ক্ষতিকর নয় এমন বিশ্বাস, সুধারণা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীছের প্রতি প্রচন্ড আবেগ বশতঃ পুস্তকটি রচনা করেছি। আল্লাহর শুকরিয়া যে, এ আবেগ কোন জাহিলী আবেগ নয়। প্রকৃতপক্ষে আমার এ উদ্যোগের পিছনে উদ্দেশ্য হলো, এই প্রখ্যাত হাদীছ বিশারদের পক্ষে প্রতিরোধ করা, যাকে গোটা মুসলিম জাতি বরণ করে নিয়েছে। যাকে তাদের ইমাম ও প্রামাণ্য দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মতবিরোধের সময় তারা যার উপর নির্ভর করে থাকে" [১৯]।

---

(১৮) ইবনু হাজার, তাগলীকুত তা'লীক, সম্পাদনাঃ সাঈদ 'আব্দুর রহমান আল কাযাকী, (বৈরুতঃ আল মাকতাবুল ইসলামী), ১/৯০, ৯১

(১৯) ইবনু হাজার, আল কাওলুল মুসাদ্দিদ ফিয যাব্বি 'আন মুসনাদিল ইমাম আহমাদ, সম্পাদনাঃ আব্দুল্লাহ আদ্দারাবীশ, (দামেস্কঃ আল ইমামাহ), পৃঃ ৩১, ৩২

তাছাড়া তিনি "আঙ্গুর ও অন্যান্য বস্তু থেকে মদ তৈরী" প্রসঙ্গে বলেনঃ "আঙ্গুরের রস যখন মদে পরিণত হয়, তখন তা সকলের মতেই হারাম। তা থেকে সামান্য হোক বা বেশি পরিমাণ হোক, পান করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে 'আলিমদের ঐকমত্য রয়েছে। ইবনু কুতাইবাহ্ একদল নির্লজ্জ আহ্লুল কালামদের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাদের নিকট আঙ্গুরের রস দ্বারা তৈরী মদ পান করা নিষিদ্ধ বলতে মাকরুহ, হারাম নয়। এটি একটি পরিত্যাজ্য উক্তি। এ মতটি গুরুত্ব দেয়ার মতো নয় " [২০]।

তাঁর সুন্নাতের প্রতি ভালবাসা ও সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরার প্রমাণ হলো যে, তিনি বিদ'আতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেননা বিদ'আত সর্বদাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাতের পরিপন্থী। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ "প্রত্যাখ্যাত বিদ'আতের একটি হলো বর্তমান সময়ে আবিস্কৃত রামাদান মাসে ফজরের প্রায় ২০ মিনিট আগে দ্বিতীয় আযান দেয়া এবং বাতি নিভিয়ে দেয়া। রোযা পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তির খাওয়া ও পান করা নিষিদ্ধ হওয়ার আলামত হিসেবে বাতিগুলোকে বিবেচনা করা হতো। মনে করা হতো যে, এই নিয়মের প্রবর্তক 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতেই এ নিয়মের উদ্ভাবন করেছেন। আর এ কথাটি অল্প মানুষেরই জানা। এ উদ্ভাবিত নিয়মটি তাদেরকে এতদূর পর্যন্ত নিয়ে গেছে যে, রোযার দিনটি পরিপূর্ণ করার জন্যে তারা সূর্যাস্তের অনেক পরে আযান দিত। বিলম্বে ইফতার করতো, দ্রুত সাহরী খেতো। এভাবে তারা সুন্নাতের খেলাফ কাজ করতো। ফলে তারা কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয় এবং অধিক অনিষ্টতার শিকার হয়"[২১]।

ইবনু হাজারের নিরপেক্ষ গবেষণা ঃ

ইবনু হাজার জ্ঞান-গরিমা, বিদ্যা-বুদ্ধি ও সংস্কৃতিতে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী ছিলেন। তিনি সমকালীন সময়ে গোঁড়ামী ও একগুয়েঁমীমুক্ত নিরপেক্ষ চিন্তা চেতনার দিক থেকে অগ্রগামী ছিলেন। যে সময় এই বিষয়টি অনেক 'আলিম ও বিদ্যানকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। তিনি বিচারকার্য সহ অন্যান্য পদে থাকা অবস্থায় গবেষণা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অগ্রাধিকার দেয়া এবং প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে ভুলের কাছে মাথা নত করতেন না, সে ভুলের উৎস যত উর্ধ্বেই হোক। সর্বদাই তিনি সত্যের পক্ষ অবলম্বন করতেন[২২]। এ কারণেই তিনি অত্যন্ত

---

(২০) ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী শারহু সহীহিল বুখারী, (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ, ১৩৭৯ হিঃ), ১০/৩৫।

(২১) ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৪/১৯৯, তা'জীলুল ইফতার, হাঃ ১৯৫৮।

(২২) ড. কামাল উদ্দীন, ইবনু হাজার আল 'আসকালানী মুআররিখান, পৃঃ ১০৫

আমানাতদারীর সাথে অন্যের কথা নকল করতেন এবং এর উৎসের কথাও যথাযথভাবে উল্লেখ করতেন। তিনি তাঁর পূর্বের ইমামদের উক্তি ও 'আলিমদের কিতাবাদি থেকে নানা তথ্য যথাযথভাবে নকল করতেন। কোন প্রকার প্রতারণার আশ্রয় নিতেন না। যেমন তাঁর লিখিত 'কিতাবুল মীযান' গ্রন্থে ইমাম আয যাহাবীর কথা নকল করার সময় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠককে স্পষ্ট করে দিতেন। যেমন তিনি বলেন যে, "আয যাহাবী বলেছেনঃ ... সমাপ্ত"। কোন কোন লেখক কর্তৃক অন্যের কথাকে খণ্ডিত করে উল্লেখ করে তার সমালোচনা করা বা অন্যের কথা নকল করে মূল প্রবক্তার দিকে কথাটিকে সম্বোধিত না করা, এ ধরনের ত্রুটির প্রতি তিনি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তিনি কোন অস্পষ্ট মাসআলাহ এবং কোন 'ইলমী সমস্যার সমাধান খুঁজে পেলে তার জন্যে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করতেন। যেমন ঃ "আমি বললামঃ আল ইয়ামীনুল গুমূস কি" (২৩)? এই প্রশ্নকারী কে ছিলেন তা লিখতে গিয়ে হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ "আমার কাছে মনে হলো যে, প্রশ্নকারী ছিলেন 'ফিরাস'। আর প্রশ্ন করা হয়েছিল 'শা'বী, অর্থাৎ 'আমিরকে'। আল্লাহর প্রশংসা যে, তিনি আমাকে অনুগ্রহ করেছেন। আল্লাহর প্রশংসা! আল্লাহর প্রশংসা! কেননা আমি এই প্রশ্নকারীর নামের ব্যাপারে পূর্বের কোন ভাষ্যকারের নিকট থেকে কোন কিছু লিখিত পাইনি" (২৪)।

তাঁর চরিত্রের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো যে, কোন বিষয়ের সমাপ্তি যেন উত্তম ও সুন্দর হয় তিনি সব সময়ই তা কামনা করতেন। তার লেখালেখি এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সময় প্রসঙ্গক্রমে বিষয়টির অবতারণা করতেন এবং 'উমার (রা) এর হাদীছঃ "হে আল্লাহ! আমাকে তোমার পথে শাহাদাত বরণ করার তাওফীক দান কর! এবং তোমার রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শহরে মৃত্যু দিও!(২৫)" এর উল্লেখ করতেন এবং ব্যাখ্যায় বলেন ঃ "এখানে উত্তম পরিণতি লাভের ইঙ্গিত আছে। তাই আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি

---

(২৩) হাদীছটির পূর্ণ বিবরণ হলোঃ 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর বলেনঃ জনৈক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বললো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! কবীরাহ গুনাহ কি? তিনি বলেনঃ "কবীরাহ গুনাহ হলো; আল্লাহর সাথে শিরক করা। সে বলে তারপর কি? তিনি বলেনঃ তারপর পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। সে বলে তারপর কি? তিনি বলেনঃ তারপর মিথ্যা কসম করা"। আমি বললামঃ আল ইয়ামীনুল গুমূস কি"? উত্তরে সে বললঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে কোন মুসলিমের সম্পদ ভোগ করে"। দেখুনঃ সহীহুল বুখারী, সম্পাদনাঃ ড. মোস্তফা দীব আল বাগা, (বৈরুতঃ দারু ইবনি কাছীর, আল ইয়ামামাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৭ঈ), বাবুল ইয়ামীনিল গুমূস, ৬/২৫৩৫।

(২৪) ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১১/৫৫৬

(২৫) সহীহুল বুখারী ২/৬৬৮, কিতাব ফাযায়িলিল মাদীনাহ।

যেন আমাদেরকে উত্তম পরিণতি দান করেন। এই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ শেষ করতে সাহায্য করেন এবং এর বিনিময়ে আমাদেরকে সুউচ্চ স্থান দান করেন। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান [২৬]"।

ইবনু হাজারের শিক্ষা ঃ

হাফিয ইবনু হাজার ৪ বছর বয়সে পিতা ও মাতাকে হারিয়ে ইয়াতীম হয়ে পড়েন। তবে তাঁর সুযোগ্য ও সচেতন পিতা মৃত্যুর পূর্বে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আবু বাকর যাকী মুহাম্মাদ ইবন 'আলী আল খারুবীকে তাঁর ছেলের ব্যাপারে অসিয়ত করে যান। তিনি তাঁর অসিয়তের যথার্থ মূল্য দেন এবং ইবনু হাজারের প্রতি যত্নবান হন। তাছাড়া তাঁর পিতা শায়খ শামস উদ্দীন ইবনুল কাত্তানকেও তার ছেলের ব্যাপারে অসিয়ত করেন। তাই ইবনু হাজার ইয়াতীম অবস্থায় ব্যবসায়ী যাকী আল খারুবীর যত্ন ও তত্ত্বাবধানে ভালভাবেই গড়ে উঠার সুযোগ পান। এই মহান ব্যক্তি তাঁর লেখাপড়ার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে কোন প্রকার শিথিলতা ও অবহেলা প্রদর্শন করেননি। এমনকি তিনি যখন পবিত্র মাক্কায় গমন করতেন তখন ইবনু হাজারকেও সাথে করে নিয়ে যেতেন। তিনি তাঁকে পাঁচ বছর বয়সে মাকতাবে ভর্তি করে দেন। এ মাকতাবেই তিনি শায়খ শামস উদ্দীন ইবনুল 'আল্লাফ এবং শামস উদ্দীন 'আতরুশের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। ৯ বছর বয়সে তিনি কারী সদর উদ্দীন মুহাম্মাদ বিন 'আব্দুর রাজ্জাক আস সাফতীর নিকট কুরআনুল কারীম হিফয করেন।

ইবনু হাজার ৭৮৫ হিজরী সনে ১২ বছর বয়সে প্রথা অনুযায়ী মাক্কার মাসজিদে হারামে তারাবীহ্ নামাযে ইমামতি করেন। তিনি সেখানে সর্বপ্রথম শায়খ 'আফীফ উদ্দীন 'আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আন্ নাশাওয়ারী (মৃ.৭৯৫হি.) এর নিকট হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর নিকটেই সহীহ আল বুখারীর অধিকাংশ হাদীছ শোনেন। একই সময়ে তিনি কাযী হাফিয জামাল উদ্দীন, মুহাম্মাদ বিন 'আবদুল্লাহ আল মাক্কীর নিকট হাফিয 'আবদুল গনী আল মাকদিসী রচিত 'উমদাতুল আহকাম' অধ্যয়ন করেন। ফিকহুল হাদীছের উপর তিনিই ছিলেন তাঁর প্রথম শায়খ। তারপর তিনি ৭৮৬ হিজরী সনে যাকী আল খারুবীর সাথে মিসর গমন করেন এবং লেখাপড়ায় আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় তিনি ছোট আকারের অনেক কিতাবাদি মুখস্ত করেন। যেমনঃ 'উমদাতুল আহকাম, (عمدة الأحكام) আল হাভী আস সাগীর,(الحاوي الصغير) মিনহাজুল উসূল, (منهاج الوصول)

---

(২৬) ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৪/১০১

আলফিয়াতুল হাদীছ' (ألفية الحديث للعراقي) আলফিয়াতু ইবনি মালিক (ألفية ابن مالك) ও আততাম্বীহ (التنبيه للشيرازي) ইত্যাদি।

তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি খুব দ্রুত মুখস্ত করতে পারতেন। প্রতিদিন তিনি কুরআন কারীম থেকে অর্ধেক 'হিযব' মুখস্ত করতেন। অধিকন্তু তিনি সাধারণ ছেলেমেয়েদের মতো করে মুখস্ত করতেন না। প্রতিটি বিষয় ধীর-স্থিরভাবে বুঝে শুনে মুখস্ত করতেন[২৭]।

ধারণা করা হয় যে, নিষ্ঠাবান অভিভাবক ব্যবসায়ী যাকী আল খারুবীর ৭৮৭ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করার কারণে ইবনু হাজারের প্রায় তিন বছর কাল লেখা পড়ার কাজ স্থগিত থাকে। তিনি ১৭ বছর পূর্ণ হওয়ার পর তাঁর অপর অভিভাবক শায়খ শামস উদ্দীন ইবনুল কাত্তান এর সঙ্গে অবস্থান করেন এবং তাঁর নিকট ফিকহ্, উসূলুল ফিকহ্, আরবী ভাষা ও অংক বিদ্যা শিখেন।

এর পর তিনি ইতিহাস ও জীবনী শিক্ষার দিকে নযর দেন। এ জন্যে তিনি এ বিষয়ে বিজ্ঞজনদেরকে অর্থের বিনিময়ে জড়ো করে তাঁদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ফলে তিনি হাদীছের বর্ণনাকারীদের (রাবীগণ) জীবনী সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি আবুল ফারাজ আল আসফাহানীর "কিতাবুল আগানী" সহ অন্যান্য ইতিহাস ও জীবনী ভিত্তিক গ্রন্থাদি পাঠ করেন।

৭৯২ হিজরী সনে তিনি আরবী সাহিত্যের দিকে নযর দেন এবং ভাষার উপর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এমনকি কবিতার কোন পংক্তি শোনা মাত্রই তিনি বলে দিতে পারতেন যে এ পংক্তিটি কোন্ কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হাফিয ইবনু হাজারের ছাত্র বুরহান উদ্দীন আল বিকা'য়ী (মৃ. ৮৮৫ হি.) বলেন ঃ তিনি ৭৮৭ হিজরী সনে সর্বপ্রথম সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। এবং সমকালীন সময়ের সকল সাহিত্যিক 'আলিমগণকে ছাড়িয়ে যান। তিনি অনেক কাসীদাহ ও কবিতা রচনা করেন [২৮]।

হাদীছ শিক্ষা ঃ

হাফিয ইবনু হাজার ৮১৬ হিজরী সনের দিকে মুসলিম উম্মাহর স্বার্থ ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করে 'ইলমুল হাদীছের দিকে অত্যধিক ঝুঁকে পড়েন। ফলে তিনি হাদীছ শাস্ত্রের প্রতি পরিপূর্ণভাবে মনোনিবেশ করেন। ৭৯৩ হিজরী সনে হাদীছের উপর তিনি কিছু শিক্ষা গ্রহণ করলেও এর পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে

---

(২৭) আস সাখাভী, আল জাওয়াহির ওয়াদ দুরার, পৃঃ ৬৩ – ৬৪

(২৮) ইবনুল 'ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারি মান যাহাবা, (বৈরুতঃ দারুল ফিকর), ৭/৭০, ইবনু হাজর, তাগলীকুত তা'লীক এর ভূমিকা ১/৮১

৭৯৬ হিজরী সনে। ঐ যুগের স্বনামধন্য শায়খদের নিকট থেকে হাদীছ সংগ্রহ করেন। হাদীছের সন্ধানে সকাল – বিকাল হাদীছবেত্তাদের দরোযায় ধরনা দেন। তৎকালীন সময়ের হাফিয যাইন উদ্দীন আবুল ফাযল 'আবদুর রহীম বিন আল হুসাইন আল 'ইরাকীর (মৃ. ৮০৬ হি.) সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং ১০ বছর সার্বক্ষণিকভাবে তাঁর সঙ্গে অবস্থান করেন। তাঁর নিকট 'ইলম হাসিল করেন। তার লিখিত "আল আলফিয়্যাহ"[২৯] ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহ তার নিকট ভালভাবে অধ্যয়ন করেন। ৭৯৮ হিজরী সনের রামাদান মাসের ২৩ তারিখে গ্রন্থকারের নীল নদের তীরে জাযীরাতুল ফীলে অবস্থিত বাড়িতেই উক্ত কিতাব পড়া সমাপ্ত করেন। তাছাড়া তাঁর রচিত "আন নিকাত 'আলা 'উলূমিল হাদীছ" গ্রন্থটিও তার কয়েকটি ক্লাসে পাঠ করেন এবং ৭৯৯ হিজরী সনের জুমাদাল উলা মাসের সর্ব শেষ ক্লাসে এটি সমাপ্ত করেন।

ইবনু হাজার হাফিয আল 'ইরাকীর নিকট উল্লেখিত ৩টি গ্রন্থ ছাড়াও অন্যান্য আরো ছোট বড় অনেকগুলো কিতাব পড়েন। আল 'ইরাকী তাঁকে উক্ত ৩টি কিতাব সহ অন্যান্য হাদীছ ও 'ইলমুল হাদীছ কিতাবগুলোও পড়ানোর অনুমতি প্রদান করেন। তিনি তাঁকে 'হাফিয' খেতাবেও ভূষিত করেন। তিনি তাঁর ভূয়সী প্রশংসা সহ তাঁর সুখ্যাতি নিয়ে সর্ব মহলে আলোচনা করেন।

তাছাড়া ইবনু হাজার মিসরে সনদের প্রসিদ্ধ ও বড় বড় শায়খদের নিকট সনদ শাস্ত্র পাঠ করেন এবং উচ্চ পর্যায়ের ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্ন শ্রবণের ক্ষেত্রে "হাদীছুস সালাফী"[৩০] এর সনদ লাভ করেন। এ বিষয়ে এটাই তখন সর্বোচ্চ সনদ হিসেবে বিবেচিত হতো। এভাবে তিনি হাদীছের উপর প্রসিদ্ধ 'আলিমগণের নিকট সনদ ও স্বীকৃতি লাভ করেন।

উপরন্তু তিনি ইতিহাস ও জীবনীর দিকে বিশেষ নযর দেয়ার কারণে অতি অল্প দিনের মধ্যেই "রিজাল" শাস্ত্রের উপর অসাধারণ জ্ঞান লাভ করেন। তিনি তাঁর শিক্ষক কায়রোর প্রখ্যাত সনদ-অভিজ্ঞ ইমাম বুরহান উদ্দীন ইসহাক বিন আহমাদ আত্তানূখীর জন্যে "আল মিআতুল 'ইশারিয়্যাহ" (المائة العشارية) এর হাদীছগুলো তাখরীজ করেন। তিনিই প্রথম তাখরীজকৃত বইটি 'আল্লামা হাফিয ওলী উদ্দীন

---

(২৯) হাফিয আল 'ইরাকী কর্তৃক মুসতালাহুল হাদীছের উপর লিখিত এক হাজার ছত্রের এক পদ্য পুস্তক। যেমন ইবনু মালিক ও ইবনু মু'তী নাহু শাস্ত্রের উপর 'আল আলফিয়্যাহ' লেখেছেন।

(৩০) ইমাম হাফিয আবু তাহির আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন সালাফাহ আল ইসবাহানীর (মৃ. ২য় হিজরী শতাব্দী) নামের দিকে সম্বোধিত করে এ সূত্রের বর্ণিত হাদীছগুলো হাদীছুস সালাফী হিসেবে পরিচিত।

বিন যুর'আহ তাঁর শায়খ ইবনুল 'ইরাকীর পুত্রের দরসে পাঠ করে শুনান। তাছাড়া অন্য শিক্ষার্থীরাও তাঁর নিকট এ কিতাবটি পাঠ করেন[৩১]।

৭৭৭ হিজরী সাল থেকে ৭৯৬ সাল পর্যন্ত ইবনু হাজারের বর্ণাঢ্য শিক্ষা জীবনে নিজেকে বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ও শিক্ষিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হন। এই সময়ে তিনি যুগের শ্রেষ্ঠ কিতাবগুলোকে মতন (টেক্সট) সহ মুখস্ত করেন। এবং তখন থেকে 'ইলমী ক্ষেত্রে অসাধারণ পরিপক্কতা অর্জন করতে সক্ষম হন। অপর দিকে ৭৯৬ হিজরী সাল থেকে তার 'ইলমী জগতের বিভিন্ন দিক ফুটে উঠে। এই সময় তিনি গবেষণা ও বিষয় ভিত্তিক লেখা পড়ার দিকে নযর দেন এবং হাদীছ ও হাদীছ শাস্ত্রের দিকে সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়েন। এ ক্ষেত্রে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী অগ্রগামী ছিলেন। তবে অন্যান্য বিষয়ে 'ইলম অর্জনকে উপেক্ষা করেননি। বরং অন্যান্য বিষয়ের উপর লিখিত মৌলিক কিতাবাদি অধ্যয়ন করেন এবং ঐ সকল বিষয়েও পারদর্শী 'আলিমদের নিকট থেকে শিক্ষা অর্জন করেন।

ফিকহ ও উসূলুল ফিকহ শিক্ষা ঃ

হাফিয ইবনু হাজার ফিকহ ও উসূলে ফিকহের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেন। যাতে করে 'ইলমে হাদীছের শিক্ষার সাথে হাদীছের অর্থ অনুধাবন করা, হাদীছের শব্দ সমূহের ভাবার্থ ও হুকুম আহকাম জানার জ্ঞানেও সমৃদ্ধ হন। এ জন্যে তিনি তাঁর দ্বিতীয় অভিভাবক ইবনুল কাত্তানের (মৃ. ৮১৩ হি.) নিকট ফিকহের শিক্ষা গ্রহণ করেন। একইভাবে তিনি ইমাম ফাকীহ 'আল্লামা বুরহান উদ্দীন ইবরাহীম বিন মূসা আল আবনাসীর (মৃ. ৮০২ হি.) নিকট ফিকহ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি তার কাছে ইমাম নববীর "আল মিনহাজ" এবং অন্যান্য আরো কিতাবাদি পাঠ করেন। বস্তুতঃ তিনি এ দু'জন খ্যাতিমান 'আলিমের নিকট সব সময় শিক্ষা লাভ করেন।

এ দু'জন শায়খ ছাড়াও তিনি শায়খুল ইসলাম 'আল্লামা আবু হাফস 'উমার বিন রাসলান আল বুলকাইনীর (মৃ. ৮০৫ হি.) নিকট ফিকহের জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি তাঁর নিকট "আর রাওযাহ" পড়েন। তাঁর লেখা "আশ শারহুল কাবীর 'আলাল মিনহাজ" থেকেও কিছু অংশ পাঠ করেন। তাছাড়া শায়খ ইমাম নূর উদ্দীন 'আলী বিন আহমাদ আল আদমীর (মৃ. ৮১৩ হি.) নিকট ফিকহ ও আরবী ভাষা অধ্যয়ন করেন। 'আল্লামা ইমাম 'ইয্যুদ্দীন ইবনু জামা'য়াহ (মৃ. ৮১৯ হি.) এর নিকট শিক্ষা লাভ করেন এবং ৮১৯ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর নিকট অনেক কিতাবাদি পাঠ করেন[৩২]।

---

(৩১) আস সাখাভী, আল জাওয়াহির ওয়াদ দুরার, পৃঃ ৬৭- ৬৯

(৩২) ইবনুল 'ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব ৭/১৪০, 'আব্দুস সাত্তার, আল হাফিয ইবনু হাজার আল 'আসক্বালানী আমীরুল মুমিনীনা ফিল হাদীছ পৃঃ ১২২

ইবনু হাজার আরো অনেক প্রসিদ্ধ শায়খের নিকট থেকে 'ইলম অর্জন করেছেন। তবে শায়খ আল বুলকাইনীর সার্বক্ষণিক সঙ্গী হিসেবে থাকেন এবং তাঁর নিকট ফাতওয়া দান ও অধ্যাপনা করার সনদ লাভ করেন। তাঁর সনদের ভাষা ছিল ঃ "প্রশ্নকারীর উত্তর প্রদানের জন্য আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম। কেননা তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী ও বিজ্ঞ ব্যক্তি"। লিখেছেন 'উমার আল বুলকাইনী"[৩৩]।

আরবী ভাষা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষা অর্জন ঃ

ইবনু হাজার আরবী ভাষা শিক্ষা অর্জনের প্রতি খুব গুরুত্ব দেন। কেননা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীছ বুঝার জন্যে আরবী ভাষা ভালভাবে জানা প্রধান ও প্রথম শর্ত। তিনি জগৎ বিখ্যাত 'আরবী ভাষার পন্ডিত এবং "আল কামুসুল মুহীত" অভিধানের লেখক মাজদ উদ্দীন আলফাইরুয –আবাদীর (মৃ. ৮১৭ হি.) নিকট থেকে 'আরবী ভাষার উপর শিক্ষা লাভ করেন। তাছাড়া সমকালীন সময়ে নাহু শাস্ত্রের অনন্য জ্ঞানী ব্যক্তি শামস উদ্দীন মুহাম্মাদ আলগুমারী (মৃ. ৮০২ হি.) এবং প্রখ্যাত নাহুবিদ জামাল উদ্দীন ইবনু হিশামের পুত্র মুহিব উদ্দীন ইবনু হিশামের (মৃ. ৭৯৯ হি.) নিকট থেকেও 'আরবী শিক্ষা লাভ করেন। তিনি শায়খ আল বদর মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আল বুশতাকীর (মৃ. ৮৩০ হি.) নিকট "'ইলমুল 'আরুয" এবং আবু 'আলী আয্‌যাফতাবীর নিকট আরবী লেখা শিক্ষা লাভ করেন[৩৪]।

'ইলমুল কিরাআত শিক্ষা ঃ

ইবনু হাজার 'ইলমুল কিরাআতে যারা ইমাম ও অভিজ্ঞ তাঁদের নিকট থেকে কিরাআত শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে তাঁর শিক্ষক 'ইলমুল কিরাআতের শায়খ 'আল্লামা বুরহান উদ্দীন আত্তানূখীর (মৃ. ৮০০ হি.) নিকট 'ইলমুল কিরাআত শিক্ষা লাভ করেন। তিনি তাঁকে এ বিষয়ে ইজাযাহ (সনদ) প্রদান করেন।

ইবনু হাজারের শিক্ষা সফর ঃ

মিসর ঃ ইবনু হাজার ২০ বছর বয়সে ৭৯৩ হিজরী সনে সর্ব প্রথম "কূস" শহরে ভ্রমণ করেন এবং সেখানকার উল্লেখযোগ্য 'আলিমদের সাথে মিলিত হন। তারপর ৭৯৭ হি. সনে ইস্কান্দারিয়া ভ্রমণ করে অনেক প্রসিদ্ধ 'আলিমের নিকট 'ইলম অর্জন করেন। তাঁদের অন্যতম হলেন হাফিয আল 'ইরাকীর শায়খ আবু 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ 'আবদুর রাযযাক আশ শাফি'য়ী (মৃ. ৭৯৮ হি.)। তিনি ধারাবাহিক সনদে শ্রবণকারীদের "হাদীছুস সালাফী" এর

---

(৩৩) আল সাখাভী, আল জাওয়াহির ওয়াদ দুরার, পৃঃ ২০৮

(৩৪) ইবনুল 'ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব, ৬/৩৬১, ৭/১৯।

বর্ণনাকারীদের সর্বশেষ ব্যক্তি ছিলেন। এখানে তিনি অনেক শায়খের নিকট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কিতাব পাঠ করেন।

ইস্কান্দারিয়া থেকে মিসরে ফিরে এসে ৭৯৯ সনে মিসর থেকে পানিপথে প্রথমে হিজাযে এবং তারপর ইয়ামান গমন করেন। ফরয হাজ্জ আদায় শেষে ৮০১ হি. সনে মিসরে ফিরে এসে মিসর ও কায়রোতে যে সব শায়খদের নিকট থেকে 'ইলম অর্জন করা বাকি ছিল তা পূর্ণ করেন। এ সময় মিসরে আন্ নাজম মুহাম্মাদ বিন 'আলী আল বালীসী (৮০৪ হি.) আর কায়রোতে উস্তাদ ছিলেন আবু ইসহাক আত্তানূখী (মৃ. ৮০০ হি.) সহ আরো অনেকে।

ইয়ামান অঞ্চল ঃ ইবনু হাজার মাক্কা সহ হিজাযের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে ৮০০ হিজরীতে ইয়ামানে পৌঁছেন এবং ইয়ামানের বিভিন্ন শহরে গিয়ে অনেক মাশায়িখের নিকট 'ইলম অর্জন করেন। তিনি তা'য়িয শহরে আবু বাকর বিন মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল খাইয়্যাত (মৃ. ৮১১ হি.) এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন।

তাছাড়া তিনি ইয়ামানের প্রসিদ্ধ শহর "যাবীদ", "'আদন" এবং "ওয়াদিউ খাসীব" সহ অন্যান্য শহরে সফর করে সে সব স্থানের প্রখ্যাত 'আলিমগণের নিকট বিদ্যা অর্জন করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত ফিকহবিদ শিহাব উদ্দীন বিন আবু বাকর আন্ নাশিরী (মৃ. ৮১৫ হি.), প্রখ্যাত 'আরবী ভাষাবিদ "আল কামূসুল মুহীত" এর লেখক মাজদ উদ্দীন আল ফাইরুয –আবাদী (মৃ. ৮১৭ হি.) এবং প্রখ্যাত ফাকীহ, ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক 'আল্লামা শরফ ইসমা'ঈল বিন মুহাম্মাদ ইবনুল মাকরী (মৃ. ৮৩৭ হি.)। ইবনু হাজার ইয়ামান থেকে ৮০০ হি. সনে মাক্কায় আসেন এবং ফরয হাজ্জ আদায় করেন।

৮০৬ হিজরী সনে ইবনু হাজার পুনরায় ইয়ামানে ভ্রমণ করেন। এই সফরে তাঁকে বহনকারী নৌকা ডুবে যায়। ফলে তাঁর টাকা পয়সা, বিভিন্ন সামগ্রী সহ কিতাবাদি হারিয়ে যায়। তবে আল্লাহর ইচ্ছায় পরে কিতাবগুলো উদ্ধার হয়। কিতাবগুলোর মধ্যে ছিল "আতরাফুল মুখতারাহ" (أطراف المختارة), "আতরাফুল মুয্যি" (أطراف المزّي), "আতরাফু মুসনাদি আহমাদ" (أطراف مسند أحمد) ইত্যাদি[৩৫]।

হিজায অঞ্চল ঃ ইবনু হাজার হাজ্জ সম্পাদন, বাইতুল্লাহর পড়শী হওয়া এবং 'ইলম অর্জনের অভিপ্রায়ে একাধিকবার হিজাযে গমন করেন। ইসলামের মূলকেন্দ্র হওয়ার কারণে সেখানে অনেক 'আলিম, মাশায়িখ, মুহাদ্দিছ এবং সনদ বিশারদগণের নিকট 'ইলম অর্জনের সুযোগ আছে। তিনি এ সুযোগের সদ্ব্যবহার

---

(৩৫) প্রাগুক্ত, ৭/১৯, মুহাম্মাদ 'আব্দুর রহমান, ফাতহুল মান্নান বিমুকাদ্দিমাতি লিসানিল মীযান ৪৯ – ৫০

করেছেন। হিজাযে যাঁদের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইমাম ইবনু তাইমিয়ার ছাত্র বিশিষ্ট 'আলিম ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ আদদিমাশকী (মৃ. ৮০৬ হি.), সিরিয়ার সনদ বিশারদ যাইনুল আবেদীন 'আব্দুর রহমান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু তুলূবিগা (মৃ. ৮২৫ হি.) এবং প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ও কিরাআত বিশেষজ্ঞ আবুল হাসান 'আলী বিন মুহাম্মাদ বিন সালামাহ্ আল মাক্কী (মৃ. ৮২৮হি.)।

তিনি পবিত্র মাদীনায় যাদের কাছ থেকে 'ইলম অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেনঃ প্রখ্যাত 'আলিম সোলায়মান বিন আহমাদ আল হিলালী (মৃ. ৮০২ হি.), বিশিষ্ট ফাকীহ্ 'আব্দুর রহমান বিন আলী আযযারনাদী (মৃ. ৮১৭ হি.) এবং মুহাম্মাদ বিন মা'আলী আল হাম্বলী (মৃ. ৮০৯ হি.)[৩৬]।

সিরিয়া অঞ্চল ঃ কিরাআতের প্রসিদ্ধ পন্ডিত ইবনুল জাযারী (মৃ. ৮৩৩ হি.) ইবনু হাজারকে অধিক জ্ঞানার্জনের জন্যে অনুপ্রাণিত করেন। বিশেষ করে সিরিয়া অঞ্চলে যাওয়ার জন্য অত্যধিক গুরুত্ব দেন। কেননা 'ইলম অর্জনের জন্যে সিরিয়া অঞ্চল শিক্ষার্থী ও 'আলিমগণের নিকট প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত ছিল। প্রকৃত পক্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিভিন্নমুখী বিদ্যার অন্যতম স্থান হিসেবে এ অঞ্চলটি বিশেষভাবে পরিচিত ছিল। এ কারণে সর্বপ্রকার বিদ্যার পন্ডিত ব্যক্তিবর্গ এ অঞ্চলে এসে জমায়েত হন। তাই ইবনু হাজার ৮০২ হিজরী সনের ২৩ শা'বান মিসরের কায়রো থেকে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হন। সঙ্গী হিসেবে তাঁর আত্মীয় যাইন শা'বান এবং মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আল ফাসী আল হাফিয (মৃ. ৮৩২ হি.) ছিলেন। তিনি সিরিয়া যাওয়ার পথে এবং সিরিয়াতে অসংখ্য 'আলিমদের নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কাযী সফর উদ্দীন সোলায়মান আল ইবশীতী (মৃ. ৮১১ হি.), ইমাম আশ শিহাব আহমাদ বিন মুহাম্মাদ ইবনুল 'আযমী (মৃ. ৮০৩ হি.), মাসজিদুল আকসার ইমাম শিহাব আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল মালিকী (মৃ. ৮১৩ হি), খাদীজাহ্ বিনতু ইবরাহীম বা'লাবাক্কী, ফাতিমাহ ও 'আয়িশা বিনতু মুহাম্মাদ ইবনু "আব্দুল হাদী, মুহাদ্দিছ আনাস ইবনু 'আলী আন নাসায়ী (মৃ. ৮০৭ হি.) প্রমুখ[৩৭]।

ইমাম হাফিয ইবনু হাজার সিরিয়াতে মোট ১০০ দিন অতিবাহিত করেন। সেখানে তিনি তার বন্ধু ইবনু আদমী নামে খ্যাত 'আলী বিন মুহাম্মাদ আদ দামিস্কী (মৃ. ৮১৬ হি.) এর বাড়িতে অবস্থান করেন। শত ব্যস্ততার মধ্য দিয়েও তিনি পড়া-শোনার কাজ অব্যাহতভাবে চালিয়ে যান। এ সময়ে তিনি অনেক প্রসিদ্ধ

---

(৩৬) ইবনু হাজার, ইম্বাউল গামর বি আম্বায়িল 'উমরি, ৬/৪৭
(৩৭) ইবনু হাজার, তাগলীকুত তা'লীক ১/১০০

কিতাবাদি পাঠ করেন বা শায়খদের নিকট থেকে শ্রবণ করেন। তারপর তিনি ৮০১ হিজরীতে হালাব যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সেখানকার প্রখ্যাত সনদ বিশেষজ্ঞদের সর্বশেষ ব্যক্তিত্ব 'উমার ইবন আইদাগামীশ (মৃ. ৮০১ হি.) এর নিকট যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই শায়খ মৃত্যুবরণ করলে সফর স্থগিত করেন। এই সফরের দীর্ঘ দিন পর ৮৩৬ হিজরী সনে তিনি পুনরায় সফর করেন এবং সেখানকার বিভিন্ন স্থানের প্রখ্যাত 'আলিমদের নিকট থেকে শিক্ষা অর্জন করেন[৩৮]।

ইবনু হাজারের মাশায়িখ ও শিক্ষকবৃন্দ ঃ

ইবনু হাজারের শিক্ষক ও শায়খদের সংখ্যা অনেক। তিনি নিজেই বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে শিক্ষা সফর শেষে তাদের নাম ও পরিচিতি নিয়ে একটি বৃহদাকারের গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেখানে তিনি ৭৩০ জন শিক্ষকের নাম লিপিবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থটির শিরোনাম হলো "আল মাজমা'উল মুআসসিস লিল মু'জামিল মুফাহরাস" "المجمع المؤسس للمعجم المفهرس"[৩৯]। ইবনু হাজার তাঁর শিক্ষকদেরকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন ঃ

এক. রিওয়ায়াত ও বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে যে সব শিক্ষকের নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন।

দুই. দিরায়াহ ও অধ্যয়নমূলক পদ্ধতিতে যে সকল শিক্ষকের নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন।

মর্যাদার ভিত্তিতে তাঁদেরকে ৪টি ভাগে বিন্যস্ত করেছেন। যতদূর সম্ভব তাঁদের পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টাও করেছেন। তবে তাঁর ছাত্র হাফিয আস্ সাখাভী তাঁর শিক্ষকগণকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন ঃ

এক. যাদের নিকট থেকে তিনি হাদীছ শুনেছেন। তাঁদের সংখ্যা হলো ২৩০ জন।

দুই. যাদের নিকট থেকে সনদ লাভ করেছেন। তাঁদের সংখ্যা ২২৫ জন।

তিন. আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যাঁদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাঁদের সংখ্যা ১৮৯ জন। তন্মধ্যে প্রায় ৫৫ জন আছেন মহিলা শিক্ষক[৪০]।

ইনবু হাজার তাঁর শিক্ষকদেরকে যে চারটি ভাগে বিন্যস্ত করেছেন তা নিম্নরূপ ঃ

---

(৩৮) আল সাখাভী, আল জাওয়াহির ওয়াদ দুরার ১১৬ – ১২০

(৩৯) সম্পাদনা করেছেন ডক্টর ইউসুফ মুরা'শালী, বৈরুতের দারুল মা'রিফাহ থেকে ১৯৯৩ সালে ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

(৪০) আল সাখাভী, আল জাওয়াহির ওয়াদ দুরার ১৩৫ – ১৭৭

এক. 'ইলমুল কিরাআত, কুরআন ও তাজবীদের শিক্ষকদের কয়েকজন হলেন ঃ ইবরাহীম বিন আহমাদ আত তানূখী আদ দিমাস্কী (৭০৯ – ৮০০ হি.), মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ 'আব্দুর রায্যাক আস সাফতী (মৃ. ৮০৮ হি.), আহমাদ বিন মুহাম্মাদ ইবনুল ফাকীহ আল খায়ূতী (মৃ. ৮০৭ হি.)।

দুই. ফিকহ ও উসূলে ফিকহের শিক্ষকমন্ডলীর মধ্যে ছিলেন ঃ 'উমার বিন রাসলান আল বুলকাইনী সিরাজ উদ্দীন আল কিনানী আশ শাফি'ঈ (মৃ. ৮০৫ হি.), 'উমার বিন 'আলী সিরাজ উদ্দীন আবু হাফস আনসারী আল আন্দালূসী 'ইবনুল মুলাককিন (মৃ. ৮০৪ হি.) এবং ইবরাহীম বিন মূসা আশ শাফি'ঈ বুরহান উদ্দীন আবু মুহাম্মাদ (মৃ. ৮০২ হি.)। উসূলুল ফিকহের শিক্ষকদের মধ্যে আবু 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবু বকর বিন জামা'আহ (মৃ. ৮১৯ হি.) অন্যতম।

তিন. আরবী ভাষা, ব্যাকরণ ও সাহিত্যের শিক্ষকমন্ডলী ঃ তাঁদের মধ্যে ছিলেন ঃ মুহিব উদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফ ইবনু হিশাম (মৃঃ ৭৯৯হিঃ), শামস উদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ বিন 'আলী আল 'উমারী আল মালিকী (মৃ. ৮০২ হি.) এবং মুহাম্মাদ বিন ই'য়াকুব আল মাজদ আল ফাইরুয –আবাদী (মৃ. ৮১৭ হি.)।

চার. হাদীছ শাস্ত্রের শিক্ষকবৃন্দঃ হাদীছের শিক্ষকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেনঃ যাইন উদ্দীন 'আব্দুর রহীম বিন আল হুসাইন আল মিসরী আশ্ শাফি'ঈ আল 'ইরাকী (মৃ. ৮০৬ হি.)। ইবনু হাজার এই মহান শিক্ষক দ্বারাই 'ইলমুল হাদীছে বেশি উপকৃত হয়েছেন। তাছাড়াও 'আলী ইবনু আবু বাকর ইবনু সোলায়মান নূর উদ্দীন আল হাইছুমী আল শাফি'ঈ (মৃ. ৮০৭ হি.), উম্মুল হাসান ফাতিমা বিন্তু মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আদ্দামাশকিয়্যাহ এবং আবু হামিদ জামাল উদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্দুল্লাহ ইবনু যাহীরাহ (মৃ. ৮১৭ হি.)।

ইবনু হাজারের ছাত্রগণঃ ইবনু হাজারের অসংখ্য ছাত্র ছিল। প্রত্যেক মাযহাবের উচ্চ পর্যায়ের 'আলিমগণও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। প্রত্যেক স্তরের শিক্ষার্থীগণ তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান লাভ করতেন। এমনও আছে যে, পিতা, পুত্র এবং পৌত্রগণও তাঁর ছাত্র ছিলেন। নিম্নে তাঁর কতিপয় স্বনামধন্য ছাত্রের নাম দেয়া হলোঃ

১. হাফিয শামস উদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্দুর রহমান ইবনু মুহাম্মাদ আশ্শাফি'ঈ (মৃ. ৯০২ হি.)। যিনি হাফিয আস্সাখাভী নামে খ্যাত ।

২. ইবরাহীম ইবনু 'উমার ইবনু হাসানুর রুবাত ইবনু 'আলী ইবনু আবু বাকর বুরহান উদ্দীন আল বিকা'য়ী আশশাফি'ঈ (মৃ. ৮৮৫ হি.)।

৩. যাকারিয়া ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনু যাকারিয়া আলআনসারী আশশাফি'য়ী যাইন উদ্দীন, শায়খুল ইসলাম, কাযিউল কুযাত (মৃ. ৭২৬ হি.)।

৪. মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্দিল্লাহ ইবনু খাইযির কুতুব উদ্দীন, আবুল খায়ের আযযুবাইদী আদ্দিমাশকী আশ্‌শাফি'য়ী (মৃ. ৮৯৪ হি.)।

৫. মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ফাহদ আল মাক্কী, তাকী উদ্দীন আবুল ফাযল আশ্‌শাফি'য়ী (৭৮৭ – ৮৭১ হি.)।

৬. মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদিল ওয়াহিদ ইবনু 'আবদিল হামীদ আল হানাফী কামাল উদ্দীন (মৃ. ৮৬১ হি.)। তিনি ইবনুল হুমাম নামে প্রসিদ্ধ।

৭. ইউসুফ ইবনু তাগরী বারদী ইবনু 'আব্দিল্লাহ আলহানাফী আবুল মাহাসিন জামাল উদ্দীন (মৃ. ৮৭৪ হি.)।

৮. মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আত্তানাসী আলমালিকী, বদর উদ্দীন, কাযিউল কুযাত (মৃ. ৮৫৩ হি.)।

৯. মুহাম্মাদ ইবনু নাসির উদ্দীন আবী 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আবি বাকর ইবনু খালিদ ইবনু ইবরাহীম আস্‌সা'আদী আলহাম্বলী বদর উদ্দীন আবুল মা'আলী শায়খুল ইসলাম কাযিউল কুযাত (মৃ. ৯০০ হি.) ।

১০. খালীল ইবনু আবিস্ সাফা ইবরাহীম ইবনু 'আব্দিল্লাহ, আবুল ওয়াফা আস্‌সালিহী আলহানাফী আলমুহাদ্দিছ (মৃ. ৯০১ হি.)।

৩. ইসলামী জ্ঞানশাখায় ইবনু হাজারের অবদান ঃ

ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় হাফিয ইবনু হাজারের বিশাল অবদান রয়েছে। তার বিশিষ্ট ছাত্র হাফিয আস্ সাখাভী তাঁর "আল জাওয়াহির ওয়াদ দুরার" (الجواهر والدرر) কিতাবে ইবনু হাজার রচিত ২৭০টি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন[৪১]। জালাল উদ্দীন আসসুয়ূতী (৯১১ হি.) তাঁর "নাযমুল 'ইকবান" (نظم العقبان) গ্রন্থে ১৯৮টির কথা বলেছেন। তাঁর আরেকজন ছাত্র বুরহান উদ্দীন আল বিকা'য়ী ১৪২টির কথা উল্লেখ করেছেন। ইবনুল 'ইমাদের মতে তাঁর রচনাবলীর সংখ্যা ৭৩টি। শায়খ মোস্তফা আফিন্দী, হাজী খালীফা নামে খ্যাত (মৃ. ১০৬৭ হি.) "কাশফুয যুনূন" (كشف الظنون) এ প্রায় ১০০ টির কথা

(৪১) প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৫

বলেছেন[৪২]। আর ইসমা'ঈল পাশা আল বাগদাদী তাঁর "হাদিয়্যাতুল 'আরিফীন" (هدية العارفين) কিতাবে ১০০টির বেশি বলে উল্লেখ করেছেন[৪৩]। তাছাড়া "তাগলীকুত তা'লীক" (تغليق التعليق) এর সম্পাদক সা'ঈদ 'আব্দুর রহমান মূসা ১৬৪টি রচনার কথা বলেছেন। কোন কোন গবেষকের মতে এ সংখ্যা ২৮২। তিনি ২৮৯টি গ্রন্থ রচনা করেছেন বলে কেউ কেউ মত দিয়েছেন। তন্মধ্যে কিছু মুদ্রিত হয়েছে। কিছু আছে হস্তলিপি আকারে। আবার কিছু কিতাব হারিয়েও গেছে[৪৪]। তাঁর লিখিত উল্লেখযোগ্য কিতাবগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ

এক. 'আকীদাহ বিষয়ক ঃ

১. আল আয়াতুন নাইয়িরাত ফী মা'রিফাতিল খাওয়ারিক ওয়াল মু'জিযাত (الآيات النيّرات في معرفة الخوارق والمعجزات)।

২. আল বাহছু 'আন আহওয়ালিল বা'ছি (البحث عن أحوال البعث)।

৩. আল গুনইয়াতু ফী মাসআলাতির রুইয়াহ (الغنية في مسألة الرؤية)।

দুই. 'উলূমুল কুরআন বিষয়ক ঃ

১. আলইতকান ফী জাম'ই আহাদীছি ফাযায়িলিল কুরআন মিনাল মারফূ' ওয়াল মাওকূফ (الإتقان في جمع أحاديث فضائل القرآن من المرفوع والموقوف)। কিতাবটি অসম্পন্ন।

২. আল ইহকাম লিবায়ানি মা ওকা'য়া ফিল কুরআন মিনাল ইবহাম (الإحكام لبيان ما وقع في القرآن من الإبهام) ।

৩. আল ই'জাব বিবায়ানিল আসবাব (الإعجاب ببيان الأسباب)।

৪. তাজরীদুত্ তাফসীর মিন সাহীহিল বুখারী (تجريد التفسير من صحيح البخاري)।

৫. মা ওকা'য়া ফীল কুরআন মিন গাইরি লুগাতিল 'আরব (ما وقع في القرآن من غير لغة العرب)।

তিন. হাদীছ ও 'উলূমুল হাদীছ বিষয়কঃ

১. ফাতহুল বারী বিশারহি সাহীহিল বুখারী (فتح الباري بشرح صحيح البخاري)। তাঁর এ কিতাবটি সর্ব সম্মতিক্রমে সাহীহ আল বুখারীর এক অনন্য শারহ বা ব্যাখ্যা এবং তাঁর সর্বোত্তম রচনা।

---

(৪২) কাশফুয যুনূন 'আন আসামিল কুতুব ওয়াল ফুনূন, (বৈরুতঃ দারুল ফিকর), পৃঃ ১/৫৪১ ।

(৪৩) হাদিয়্যাতুল 'আরিফীন, (বৈরুতঃ দার ইহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, ১৯৫১ ঈ), ৫/১২৮ - ১২৯।

(৪৪) মুহাম্মাদ 'আব্দুর রহমান, ফাতহুল মান্নান বিমুকাদ্দিমাতি লিসানিল মীযান, পৃঃ ৮২ - ৮৩

২. আল কাওলুল মুসাদ্দাদু ফীয্ যাব্বি 'আন মুসনাদিল ইমাম আহমাদ. (القول المسدّد في الذبّ عن مسند الإمام أحمد) ।

৩. তুহফাতু আহলিত তাহদীছ 'আন শুয়ূখিল হাদীছ (تحفة أهل التحديث عن شيوخ الحديث) ।

৪. তাগলীকুত তা'লীক (تغليق التعليق) ।

৫. তাকরীবুল মানহাজ বিতারতীবিল মুদরাজ (تقريب المنهج بترتيب المدرَج) ।

৬. আদ্দিরায়াতু ফী তাখরীজি আহাদীছিল হিদায়াহ (الدراية في تخريج أحاديث الهداية) ।

৭. নুখবাতুল ফিকার ফী মুসতালাহি আহলিল আছার (نخبة الفكَر في مصطلح اهل الأثر) ।

৮. নুযহাতুন নাযার ফী তাওযীহি নুখবাতিল ফিকার (نزهة النظر في توضيح نخبة الفكَر) ।

চার. রিজাল শাস্ত্র ও আল জারহ্ ওয়াত তা'দীল বিষয়ক ঃ

১. আসমাউ রিজালিল কুতুব (أسماء رجال الكتب) ।

২. তাহযীবুত তাহযীব (تهذيب التهذيب) । এ কিতাবটি মূলতঃ "তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল" (تهذيب الكمال في أسماء الرجال) এর সার সংক্ষেপ।

৩. তাকরীবুত্ তাহযীব (تقريب التهذيب) এ কিতাবটিও পূর্বের কিতাবটি 'তাহযীবুত তাহযিব' এর সার সংক্ষেপ।

৪. লিসানুল মীযান (لسان الميزان) ।

৫. নুযহাতুল আলবাব ফিল আলকাব (نزهة الألباب في الألقاب) ।

পাঁচ. ইতিহাস, সীরাত ও জীবনী বিষয়ক ঃ

১. আল ইসাবাতু ফী তাময়ীযিস সাহাবাহ (الإصابة في تميز الصحابة) ।

২. ইম্বাউল গামরি বিআম্বাইল 'উমরি (إنباء الغمر بأنباء العمر) ।

৩. আদ্দুরারুল কামিনাহ ফী আ'ইয়ানিল মিআতিছ ছামিনাহ (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة) ।

৪. আল মু'আম্মারীনা ফিল ইসলাম (المعمَّرين في الإسلام) ।

৫. মুখতাসারুল বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ লি ইবনি কাছীর (مختصر البداية والنهاية لابن كثير) ।

ছয়. ফিকহ্ বিষয়ক ঃ

২. বুলূগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম (بلوغ المرام من أدلّة الأحكام)। তিনি এ কিতাবটি তাঁর ছেলে আবুল মা'আলী মুহাম্মাদ বদর উদ্দীনের জন্যে লিখেছেন।

৩. শারহু রাওযাতুত তালিবীন লিল ইমাম আন-নববী (شرح روضة الطالبين للإمام النووي)।

৪. শারহু মানাসিকিল মিনহাজ লিল ইমাম আন নববী (شرح مناسك المنهاج للإمام النووي)।

৫. মানাসিকুল হাজ্জ (مناسك الحج)।

৬. আন নিকাত 'আলা "শারহি 'উমদাতিল আহকাম' লিল হাফিয 'আব্দিল গনী আল মাকদাসী" লি ইবনিল মুলাক্কিন (النكت على "شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي" لابن الملقّن)।

সাত. বিভিন্ন বিষয়াদি সম্পর্কিত ঃ

১. তাহরীর "মুকাদ্দিমাতুন ফীল 'আরূয" (تحرير "مقدمة في العروض")।

২. আত্তাযকিরাতুল আদাবিয়্যাহ (التذكرة الأدبيّة)।

৩. ইত্তিবা'উল আছর ফী রিহ্‌লাতি ইবনি হাজার (اتباع الأثر في رحلة ابن حجر)।

৪. ইকামাতিদ দালাইল 'আলা মা'রিফাতিল আওয়ায়িল (إقامة الدلائل على معرفة الأوائل)।

৫. মুখতাসার "তালবীসু ইবলীস লি ইবনিল জাওযী" (مختصر "تلبيس إبليس لابن الجوزي")।

এ ছাড়া তিনি আরো অনেক বিষয়ের উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি এ সব মৌলিক ও শাখা-প্রশাখা বিষয়ক রচনাবলী দ্বারা জ্ঞানের জগতে এক বিস্ময়কর অবদান রেখেছেন। অপরদিকে সমৃদ্ধ করেছেন গ্রন্থাগারগুলোকে।

৪. হাফিয ইবনু হাজারের কর্মময় জীবন ঃ

ইবনু হাজার মিসরে মামলূক সরকারের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ চাকুরী করেছেন। যার ফলে তিনি মিসরের সমসাময়িক কালের রাজনীতি এবং জাতীয় আয় সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। তিনি সমকালীন ঘটনা প্রবাহের মূল উৎসগুলোর সাথে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করার সুযোগ পান। তাই তিনি তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে অনেক দায়িত্ব পালন করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

এক. ইমলা[৪৫] করা ঃ হাফিয ইবনু হাজার "ইমলা" পদ্ধতিটি চার দশক ধরে পুনর্জীবিত করেছেন। তিনি দীর্ঘ ৪০ বছর পর্যন্ত নিজের মুখস্ত বিদ্যা থেকে জ্ঞানের আসরগুলোতে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তাঁর এ কর্মের মাধ্যমে 'ইমলা' পদ্ধতিটি ব্যাপক উন্নতি লাভ করে।

ইমলার গুরুত্ব ঃ ইমলা রিওয়ায়াত এবং শ্রবণ-এর উচ্চ স্তর বিশিষ্ট একটি পদ্ধতি। 'ইলমের দায়িত্ব পালনের জন্যে এটি একটি শক্তিশালী ও উত্তম উপায়। একজন বিজ্ঞ 'আলিম ও বিদ্যান ব্যক্তি পাঠ দান করতে বসে নিজের মুখস্ত অথবা কোন কিতাব থেকে ছাত্রদেরকে পাঠ দান করে থাকেন। কোন হাদীছ পড়ানোর সময় হাদীছের মধ্যে কি কি হুকুম আহকাম, গবেষণার বিষয় এবং শ্রোতাদের জন্যে উপকারী বিষয়াদি আছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেন। হাদীছের শুদ্ধ অশুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করেন। সনদের বর্ণনাকারীদের জারহ ও তা'দীলের মাধ্যমে মূল্যায়ন পেশ করেন। তাছাড়া আরো অনেক বিষয় নিয়ে সবিস্তারে

---

(৪৫) ইমলা শব্দটির আভিধানিক অর্থ পূরণ করা। পারিভাষিকভাবে বিশেষ পদ্ধতিতে কোন বিষয়কে লিখিয়ে দেয়াকে বুঝায়। শ্রবণের যতগুলো পদ্ধতি আছে তন্মধ্যে সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো মানুষ ইমলা করতে গিয়ে যা লিখে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাজা বাদশাহদের উদ্দেশ্যে লিখা ও সন্ধি করার সময় লিখিত চিঠিগুলো ইমলা করেছেন। হাদীছ শাস্ত্র ও ভাষার উপর যারা 'হাফিয' উপাধি লাভ করেন তাদের অন্যতম দায়িত্ব হলো ইমলা করানো। এ পদ্ধতিটি বাস্তবায়ন করতে ইমলাকারী (মুমলী) এর কতিপয় আদব রয়েছে আবার ইমলা লিপিবদ্ধকারী (মুসতামলী) এরও কিছু আদব আছে। মুহাদ্দিছ বা মুমলীর আদবসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ হাদীছের বর্ণনা করার জন্যে তার পরিপূর্ণ প্রস্তুতি থাকা, নিজের শরীর, অবয়ব এবং সুরতকে সুন্দর করে নেয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করা; সাদা পোশাক হওয়া বাঞ্চনীয়, দাঁত ও মুখ পরিষ্কার হওয়া, গোঁফ সুন্দরভাবে ছাঁটানো হওয়া, আতর খোশবু ব্যবহার করা, তার মধ্যে ছোট বড় সকল মুসলিমকে সালাম দেয়ার অভ্যাস থাকা, ইমলার বৈঠকে বসার পূর্বে দু রাকা'আত সালাত আদায় করা উত্তম, ইমলা মাসজিদের মধ্যে হওয়া, বিশেষ করে জুমু'আর দিনে হওয়া।

অপরদিকে ইমলার লেখক বা মুসতামলীর উল্লেখযোগ্য আদব হলোঃ তার মতো আরো কিছু যোগ্য ব্যক্তিদেরকে নিজের সাথে শামিল করা, ইমলা করার সময় প্রথম লাইনে শুধু " بسم الله الرحمن الرحيم " লেখা অন্য কিছু না লেখা, তারপর যার নিকট থেকে ইমলা শুনছে বা লিখছে সে শায়খের নাম, উপাধি ও বংশের নাম লেখা, তারপর শায়খের প্রতি শব্দ মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা এবং যা লেখায় তা লিখে ফেলা ইত্যাদি।

দেখুনঃ আসসুয়ূতী, 'আব্দুর রহমান বিন আবু বকর, আল মুযহির, ১/৩০০, ... ??? http://www.alwarraq.com, আসসাম'আনী, ইমাম আবু সা'ঈদ 'আব্দুল কারীম বিন মুহাম্মাদ আততামীমী, আদাবুল ইমলা ওয়াল ইসতিমলা, সম্পদনাঃ সা'ঈদ মুহাম্মাদ আল লাহ্হাম, তত্ত্বাবধায়নঃ মাকতাবুদ্দিরাসাত ওয়াল বুহুছুল 'আরাবিয়্যাহ ওয়াল ইসলামিয়্যাহ, (বৈরুতঃ দার ও মাকতাবুল হিলাল, ১ম সংস্করণ, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ ঈ.), ১/ ১৮, ৩৩ – ৫৩, ১৮৯।

আলোচনা ও পর্যালোচনা করেন। ইমলার দাবী হলো এমন ব্যক্তিকে ইমলার কাজে লাগানো হবে যিনি নিজেও মেধাসম্পন্ন ও সচেতন 'আলিম হবেন। যাতে করে তিনি উপস্থিত সকলকে ইমলাকারী 'আলিমের বিস্তারিত বক্তব্য ও আলোচনা তুলে ধরতে পারেন।

ইমলার অপরিসীম গুরুত্বের কারণে কেবল ব্যুৎপত্তি অর্জনকারী এবং 'ইলম ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে উঁচু মর্যাদায় আরোহণকারী ব্যক্তিবর্গ এ দায়িত্ব পালন করেছেন। যুগ যুগ ধরে বড় বড় হাফিয ও মুহাদ্দিসগণই ইমলার দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। ইমাম ইবনুস্ সালাহ (মৃ. ৬৪৩ হি.) এ দায়িত্ব পালন করেছেন। তারপর হাফিয যাইন উদ্দীন আল 'ইরাকী ৭৯৬ হিজরী থেকে শুরু করে তাঁর মৃত্যু ৮০৬ হি. পর্যন্ত প্রায় চার শতের অধিক দারসে ইমলা করেছেন। তারপর তাঁর ছেলে আবু যুর'আহ (৮২৬ হি.) আমৃত্যু প্রায় এক হাজারেরও অধিক বৈঠকে ইমলা করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার ৮০৮ হিজরী থেকে ইমলার শিক্ষা বৈঠক শুরু করে ৮৫২ হিজরী পর্যন্ত অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত জারি রাখেন। এ সময়ে তিনি এক হাজারেরও অধিক বৈঠক করেন। তাঁর এ বৈঠকগুলোর বক্তৃতা দিয়ে "আল আমালিল হাদীছিয়্যাহ" নামক ১০ খন্ডের এক বিশাল গ্রন্থ রচিত হয়। তিনি সাধারণতঃ সপ্তাহে এক দিন হয় মঙ্গলবার না হয় জুমাবার এ বৈঠকের ব্যবস্থা করতেন। যাতে করে পাঠকদের মধ্যে কোন প্রকার বিরক্তির উদ্রেক না হয়। ইমলার জন্যে তাঁর ছাত্রের সংখ্যা ছিল ১৫০ জন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেনঃ

আল মুহাদ্দিছ শিহাব উদ্দীন আহমাদ ইবনু আবি বাকর আল বুসীরী আশ শাফি'ঈ (মৃ. ৮৪০ হি.), ইমাম 'আল্লামাহ 'ইয্যুদ্দীন 'আব্দুস সালাম ইবনু আহমাদ আল বাগদাদী আল হানাফী (মৃ. ৮৫৯ হি.) এবং 'আল্লামা কামাল উদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু হাসান আশ্শুমুন্নী আল মালিকী (৮২১ হি.)। এ বৈঠকগুলো সাধারণত তাঁর নিজ বাড়ি এবং বিভিন্ন মাদরাসায় অনুষ্ঠিত হতো। ইবনু হাজার তাঁর মুখস্ত থেকেই ইমলা করতেন। তিনি কখনো একই বিষয়ের উপর ইমলা করতেন। যেমনঃ তাঁর গ্রন্থ "আল–ইসাবাহ্ ফী তাময়ীযিস সাহাবাহ"। কখনো কোন একটি কিতাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে হাদীছের বিভিন্ন উপকারী বিষয়ের উপর ইমলা করতেন[৪৬]।

দুই. অধ্যাপনা ঃ ৬৫৬ হিজরীতে বাগদাদের পতনের ফলে কিতাবাদি, বই পুস্তক ও লাইব্রেরী ধ্বংস হওয়ার কারণে মিসরই তখন ইসলামের দুর্গ হিসেবে গড়ে

---

(৪৬) প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৬ - ১২৮

উঠে। জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারের মিনার হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই শাসক, সৎব্যক্তিবর্গ ও 'আলিমগণ প্রচুর মাদরাসা ও খানকা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে অনেক সম্পদ ওয়াকফ করেন। তাঁরা এ প্রতিষ্ঠানে লেখা-পড়া করার জন্যে প্রচুর উৎসাহ দেন। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এ সব প্রতিষ্ঠানে পড়া-লেখা করার জন্যে ছাত্রগণ আসতে থাকে। বড় বড় বিজ্ঞ 'আলিমগণই কেবল তাদেরকে পাঠ দান করেন। তাঁদের অন্যতম ছিলেন 'আল্লামা হাফিয ইবনু হাজার। তাঁর শিক্ষকদের নিকট থেকে পাঠদানের অনুমতি লাভ করার অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর যোগ্যতার কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে তাঁর নিকট থেকে শিক্ষা লাভের জন্যে বিভিন্ন দিক থেকে শিক্ষার্থীরা তাঁর নিকট আসতে থাকে। তিনি বিভিন্ন মাদরাসা ও মাসজিদে তাফসীর, হাদীছ, ফিকহ সহ অনেক বিষয়ে দারস দিতেন।

তিন. ফাতওয়া প্রদান ঃ হাফিয ইবনু হাজার ৮১১ হিজরীতে "দারুল 'আদল" এর ফাতওয়া প্রদানের দায়িত্ব নেন এবং মৃত্যুবরণ করার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত ৪১ বছর এ দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তিনি প্রচুর ফাতওয়া প্রদান করেন। জনৈক হাফিয বুরহান ইবনু হাজারের এক মাসের ফাতওয়া লিপিবদ্ধ করেছিলেন, যার সংখ্যা ছিল তিনশত মাসআলাহ। তাহলে দীর্ঘ ৪১ বছরের ফাতওয়ার সংখ্যা কত হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়[(৪৭)]।

চার. বিচার কার্য ঃ ৮০০ হিজরী সনের পূর্বে সদর উদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম (মৃ. ৮০৩ হি.) ইবনু হাজারের নিকট ভারপ্রাপ্ত বিচারক হওয়ার প্রস্তাব করলে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। এরপরও বিভিন্ন দায়িত্বশীল তাঁর নিকট বিচারকের দায়িত্ব পালন করার প্রস্তাব দিলেও তিনি একইভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন। এমনকি ইয়ামানের বাদশাহ নাসির ইবনু আশরাফ তাঁর অপেক্ষায় দুই বছর পর্যন্ত বিচারকের পদ খালি রাখেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। তবে ইবনু হাজারের এ অনড় অবস্থান পরবর্তীতে পরিবর্তিত হয়। কেননা বিচার সংক্রান্ত কিছু কিছু বিষয় তাঁর দায়িত্বে চাপানো হয়। যেমন ঃ

১. সুলতান আল মুআইয়্যাদ শায়খ ৮২২ হিজরীতে ইবনু হাজারকে একটি বিশেষ বিচারের দায়িত্ব দেন। বিচারটি ছিল শাফি'ঈ মাযহাবের তখনকার প্রধান বিচারক আল হারাভী এবং তাঁর প্রতিপক্ষ খালীল ও কুদ্দুস এলাকার কতিপয় লোকদের মধ্যে। বাদীগণ বিচারক আল হারাভীর বিরুদ্ধে তাদের উপর তাঁর তত্ত্বাবধানকালীন সময়ে বিপুল

---

(৪৭) আস সাখাভী, আল জাওয়াহির ওয়াদ্দুরার, পৃঃ ১০৭

পরিমাণ সম্পদ গ্রহণের অভিযোগ করেন। হাফিয নিজেই এ ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেন ঃ এ বিচারের রায় প্রধান বিচারক আল হারাভীর বিরুদ্ধে গিয়েছিল।

২. ইবনু হাজারের অন্তরঙ্গ বন্ধু জালাল উদ্দীন আল-বুলকাইনী (মৃ. ৮২৪ হি.) এর বিশেষ অনুরোধে তাঁর ভারপ্রাপ্ত হিসেবে সচরাচর বিচারকার্য পরিচালনা করতেন।

৩. বিচারক আল-বুলকাইনীর মৃত্যুর পর বিচারক ওলী উদ্দীন 'ইবনুল 'ইরাকী (মৃ. ৮২৬ হি.) বিচারের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। তাঁর বিশেষ অনুরোধে ইবনু হাজার তাঁর ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

এ সব কারণে ইবনু হাজার ৮২৭ হিজরী সনে শেষ পর্যন্ত বাদশাহ আশরাফ বারসাবাই এর ক্ষমতাকালে স্থায়ীভাবে এ দায়িত্ব পালন করেন। তবে এক্ষেত্রে তিনি স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য নিজের মধ্যে সুদৃঢ়ভাবে লালন করেন। যেমন ঃ

ক. তিনি বিচারকের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে খুব আগ্রহী ছিলেন না। এমনকি এ পদের জন্যে আকর্ষণীয় বেতন ভাতা ও সুযোগ সুবিধার প্রতিও তাঁর কোন লোভ ছিল না।

খ. বিচারক হিসেবে নিজের পদ মর্যাদার প্রতি অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। বিচারকের দায়িত্ব পালনকালে সকল শ্রেণীর নাগরিকের সাথে দুর্বলতার উর্ধ্বে উঠে ইনসাফের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। শাসক ও শাসিতের মধ্যে পার্থক্য করেননি। কোন প্রকার হুমকি ধমকি ও লোভ লালসার নিকট নত হননি।

গ. শক্ত ও কঠিন অবস্থানের কারণে অনেকেই তাঁর শত্রু হয়ে পড়ে।

ঘ. তিনি যতদূর সম্ভব বিচার কাজে সেক্রেটারী, উপ পরিচালক এবং ভারপ্রাপ্ত নিয়োগের সময় সূক্ষ্মভাবে বাছাই করতেন। এক্ষেত্রে তাঁর সাথীদের মধ্যে যারা উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন তাঁদেরকেই নিয়োগ দেয়ার চেষ্টা করতেন। যার ফলে পরবর্তীতে তাঁদের অনেকেই রাষ্ট্রের উচ্চ পদ লাভ করেন[(৪৮)]।

পাঁচ. বক্তৃতা, ওয়ায নসীহত ও ইমামতি করা ঃ তিনি প্রসিদ্ধ জামে' মাসজিদগুলোতে খুৎবাহ দিতেন। যেগুলোতে আমীর, সুলতান ও বড় বড় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকেরা সালাত আদায় করতেন। এ সব মাসজিদগুলোর মধ্যে কয়েকটি

---

(৪৮) ড. মুহাম্মাদ কামাল, ইবনু হাজার মুআররিখান, পৃঃ ৬৮ – ৭৩

হলোঃ জামি'উল আযহার, জামি' 'আমর ইবনুল 'আস, জামি'উল কিল'আহ, জামি' বানী উমাইয়্যাহ। তাছাড়া তিনি জামি'উয যাহিরে লোকদের মাঝে ওয়ায নসীহত করার দায়িত্বও পালন করেন।

ছয়. লাইব্রেরীর দায়িত্ব ঃ মিসরে 'আল মাদরাসাতুল মাহমুদিয়াহ' নামে একটি প্রসিদ্ধ মাদরাসা ছিল। মাহমুদ বিন 'আলী আল–ইস্তাদার ৭৯৭ হিজরীতে এ মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে একটি বিশাল লাইব্রেরী গড়ে উঠে। এ লাইব্রেরীতে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রচুর কিতাব ছিল। বর্তমান সময়েও এ লাইব্রেরীটি কায়রোর একটি প্রসিদ্ধ লাইব্রেরী হিসেবে খ্যাত।

হাফিয ইবনু হাজার এ লাইব্রেরীর তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করেন। সপ্তাহের একদিন তিনি লাইব্রেরীতে সময় দিতেন। পাঠকদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে লাইব্রেরীর সকল বইয়ের বিষয় ভিত্তিক ও শিরোনাম ভিত্তিক দুটি সূচিপত্র তৈরি করেন। তাছাড়া তিনি লাইব্রেরীর হারিয়ে যাওয়া অনেক দুর্লভ কিতাব উদ্ধার করেন। উপরন্তু তিনি নিজেও লেখালেখির ক্ষেত্রে এ লাইব্রেরী থেকে উপকৃত হন। তিনি সারা সপ্তাহ জুড়ে নিজের প্রয়োজনীয় বইগুলো নোট করতেন এবং নির্দিষ্ট দিনে লাইব্রেরীতে গিয়ে সেগুলো বের করে গবেষণার কাজ করতেন[(৪৯)]।

ইবনু হাজারের অসাধারণ প্রতিভা অর্জনের ক্ষেত্রে কিছু কারণ ঃ

হাফিয ইমাম ইবনু হাজার অসাধারণ জ্ঞান, প্রতিভা ও যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। যার ফলে তিনি তাঁর শিক্ষকদের উপরেও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন। তাঁর এই সুখ্যাতির পেছনে ঐতিহাসিকগণ কতিপয় কারণ নির্ণয় করেছেন। যেগুলো তাঁর এ অর্জনের ক্ষেত্রে সহায়ক ছিল। এগুলোর মধ্যে কিছু আছে তাঁর ব্যক্তিগত গুণাবলী। আর কিছু আছে পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ। কারণগুলো হলোঃ

এক. পারিবারিক ঐতিহ্য ঃ তাকওয়া ও সততার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা একটি পরিবার থেকেই তিনি বংশানুক্রমিকভাবে বিদ্যা অর্জন করেন। তাঁর দাদা অনেক স্বনামধন্য 'আলিমদের নিকট থেকে বিদ্যা অর্জন করেন। তাঁর পিতার চাচাও ছিলেন প্রসিদ্ধ ফকীহ ও গবেষক। পিতা ছিলেন একাধারে ফিকহ, আরবী ভাষা ও সাহিত্যের পন্ডিত। তাঁর বোন ছিলেন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন । যিনি তাঁকে মায়ের আদর দিয়ে মানুষ করেছেন। তাঁর সম্পর্কেই ইবনু হাজার নিজেই বলেন ঃ "তিনি আমার মায়ের মতো"[(৫০)]।

---

(৪৯) ইবনু হাজার, ইম্বাউল গামর ৩/৮৮, ৯৫, ৭/২০৭

(৫০) ইবনু হাজার, আল মাজমাউল মুআসসিস, ৩/১২০

দুই. সম্পদ ও প্রাচুর্য ঃ ইবনু হাজার বংশানুক্রমিকভাবে 'ইলমের উত্তরাধিকারী হওয়ার পাশাপাশি পিতা-মাতার নিকট থেকে বিশাল সম্পদও অর্জন করেন। ফলে তাঁকে জীবন পরিচালনা ও বিদ্যা অর্জনের পথে আর্থিক সংকটে পতিত হতে হয়নি। বরং বিদ্যা অর্জনের জন্যে তিনি নিঃশ্চিন্তে নিজের সম্পদ ব্যয় করতে পেরেছেন। কিতাবাদি ক্রয়, দেশ-বিদেশ সফর এবং জীবন পরিচালনার জন্যে যে বিপুল ব্যয় হতো তা নিজের সম্পদ থেকেই নির্বাহ করতেন।

তিন. তাকওয়া বা আল্লাহ-ভীতি ঃ তিনি খাওয়া, পান করা, কাপড় পরিধান এবং জীবিকা নির্বাহে অত্যন্ত মিতব্যয়ী ছিলেন। তাছাড়া তাঁর মধ্যে ছিল তাকওয়া, সততা, দয়া-অনুগ্রহ, নিঃর্মোহ মন, সালাত আদায়, সিয়াম পালনসহ সকল প্রকার সৎগুণ। ফলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 'ইলম অর্জনের জন্যে তাঁর মেধা ও অন্তরকে খুলে দিয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তিনি তোমাদেরকে জ্ঞান ও ইলম দান করবেন"। (আল বাকারাহ ঃ ২৮২)

চার. ব্যক্তিগত মেধা ও প্রতিভা ঃ তাঁর ছিল অদ্ভূত মেধাশক্তি, প্রখর মুখস্ত ক্ষমতা, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, মনযোগ সহকারে দ্রুত পাঠ করার যোগ্যতা এবং অতি দ্রুত লিখার অভ্যাস। এ বিশেষ গুণাবলীর দরুন আল্লাহ তা'আলা তাঁর মধ্যে এক অনন্য যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ফলে তিনি জ্ঞানের জগতে এক বিস্ময়কর অবদান রাখতে সক্ষম হন।

তাঁর মুখস্ত শক্তি এতটাই প্রখর ছিল যে, মাত্র দুদিনের কিছু বেশি সময় নিয়ে ৪টি বৈঠকে সহীহ মুসলিম পাঠ ও মুখস্ত করেন। অনুরূপভাবে ইমাম নাসাঈর 'আল কাবীর' গ্রন্থটি ১০ বৈঠকে শেষ করেন। তাছাড়া সহীহ আল বুখারী সহ অন্য গ্রন্থগুলোও অল্প সময়ের মধ্যে অধ্যয়ন করেন[৫১]।

পাঁচ. বিদ্যা অর্জনের পথে প্রতিকূলতা এবং দৃঢ়তার সাথে তা মুকাবিলা ঃ ইবনু হাজার বিদ্যা অর্জনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ছিলেন। সকাল বিকাল দুপুর সকল সময়েই 'ইলম অর্জনের পেছনে সময় দিতেন। কোন প্রকার অলসতা ও ক্লান্তি তাঁকে এ পথ থেকে একটু সময়ের জন্যে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি। 'ইলম শিক্ষার জন্যেই তিনি ইসলামী দুনিয়ার আনাচে কানাচে নিরলস ও নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এ কারণে তাঁকে অনেক সমস্যা ও বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। সুদৃঢ় মনোবল ও বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তের ফলে ধৈর্যের সাথে সকল প্রতিবন্ধকতার মুকাবিলা করেছেন। দ্বিতীয়বার ইয়ামানে যাওয়ার সময় নৌকা

---

(৫১) আসসাখাভী, আল জাওয়াহির ওয়াদ্দুরার, পৃঃ ১০৩

ডুবে তাঁর কিতাবাদি সহ টাকা-পয়সাও হারিয়ে যায়। এগুলো উদ্ধারের জন্যে দ্বীপ অঞ্চলে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেছেন[৫২]।

ছয়. প্রসিদ্ধ ও খ্যাতিমান শিক্ষকবৃন্দ ঃ ইবনু হাজারের জ্ঞানের জগতে অসাধারণ স্বাক্ষর রাখার পেছনে আরেকটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো, তিনি যে সব শিক্ষক ও শায়খদের নিকট বিদ্যা অর্জন করেছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন স্ব-স্ব ক্ষেত্রে উজ্জ্বল নক্ষত্র। স্বনামধন্য 'আলিমদের নিকট পড়া-লেখা করা ও বিদ্যা অর্জন করার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ঃ আল 'ইরাকী, আল হাইছামী, আল বুলকাইনী, ইবনুল মুলাক্কিন, ইবনু জামা'য়াহ, আল ফায়রুয-আবাদী এবং আততানূখী প্রমুখ। ইবনু হাজার কর্তৃক লিখিত গ্রন্থ " আল মাজমা'উল মুআস্‌সিস"এ ৭৩০ জন শিক্ষক শিক্ষিকার কথা উল্লেখ আছে। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম শিক্ষক মৃত্যুবরণ করেন ৭৭৪ হিজরী সনে আর সর্বশেষ শিক্ষকের মৃত্যুকাল ছিল ৮৭০ হিজরী সন[৫৩]।

সাত. পরিকল্পিত সময় দান ঃ তিনি সর্বদাই সময়ের মূল্য দিয়ে সময়ের সদ্ব্যবহার করতেন। তাঁর অভিষ্ট লক্ষ্যই ছিল অধ্যয়ন করা, পড়া-লেখা করা, শোনা, 'ইবাদাত বন্দেগী করা, বই-পত্র লেখা এবং শিক্ষাদান করা। মূলকথা একটি মুহূর্তও তিনি সময় নষ্ট করতেন না। এমন কি খাবারের সময় এবং পথ চলার সময়ও তিনি কোন না কোনভাবে 'ইলমের সেবা করে যেতেন। সকাল বেলা ফজরের সালাত আদায়, তারপর যিকর-আযকার পাঠ, তারপর কিতাবাদি পাঠ ও বই লেখা। অতঃপর বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। আবার আসর নামায ও ইশার নামাযের পর দারস ও পাঠ দানের মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করতেন। কোথাও কোন সময় অপচয় হওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে সঙ্গে সঙ্গে হয় তিনি নামায আদায় করতেন অথবা মাসহাফ বের করে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। একবার মাদরাসায় এসে দেখতে পান ভুলে চাবিটি রেখে এসেছেন। তখন কাঠমিস্ত্রি ডাকা হলো। মিস্ত্রির যতক্ষণ দরোযা খুলতে সময় লাগল ততক্ষণ তিনি সালাত আদায় করলেন[৫৪]।

আট. প্রচুর কিতাব ও বিশাল লাইব্রেরী ঃ তাঁর নিকট পর্যাপ্ত কিতাব ছিল। তা ছাড়া অনেক বড় বড় লাইব্রেরী তাঁর তত্ত্বাবধানে ছিল। ফলে সেখানে তিনি অধ্যয়নের জন্যে পর্যাপ্ত কিতাবাদি পান। তাঁর নিজের সংগ্রহেও অনেক মৌলিক কিতাব ছিল। এমনকি কোন কোন কিতাবের একাধিক কপিও তাঁর নিকট ছিল।

---

(৫২) প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৯
(৫৩) ইবনু হাজার, আলমাজমা'উল মুআসসিস ৩/৬
(৫৪) আল সাখাভী . আল জাওয়াহির ওয়াদ্দুরার, পৃঃ ১১০- ১১১

তিনি সেগুলোকে মিলিয়ে মিলিয়ে পড়া-লেখা ও গবেষণা করতেন। তাঁর ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য লাইব্রেরীগুলো হলোঃ মাদ্‌রাসা নিযামিয়্যাহ কাদীমাহর কুতুবখানা (خزانة كتب المدرسة النظاميّة القديمة), মাদ্‌রাসা সাহিবিয়্যাহ বাহাইয়্যাহর কুতুবখানা (خزانة كتب المدرسة الصاحبيّة البهائيّة), মাদ্‌রাসা মাহমূদিয়্যাহর কুতুবখানা (خزانة كتب المدرسة المحمودية)।

নয়. পদ-পদবী ও পেশা ঃ ইবনু হাজার বিচারকের দায়িত্ব পালন করতেন। তাছাড়া তিনি ফাতওয়া প্রদান করা, অধ্যাপনা করা, লেকচার লেখানো, জুমু'আর খুৎবাহ প্রদান সর্বসাধারণের মধ্যে ওয়ায-নসীহত করা ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এ সব কারণে তাঁর সর্বদা গবেষণা, সম্পাদনা এবং পর্যাপ্ত লেখা-পড়া করার প্রয়োজন ছিল। প্রতিনিয়ত তাঁর নিকট ইসলামের নানা বিষয়ে প্রশ্ন, যুগ জিজ্ঞাসা, বহু রকমের সমস্যা আসতো। তাকে সেগুলোর জবাব দিতে হতো। তাছাড়াও তাঁর সঙ্গী-সাথী ও ছাত্রদের গবেষণার তদারকি, অধিকতর 'ইলমী আলোচনা পর্যালোচনার কারণে তাঁকে যথেষ্ট পরিমাণ লেখা-পড়া করতে হতো। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে অধ্যয়ন করতেন। ফলে তাঁর মধ্যে ব্যাপক 'ইলম ও জ্ঞান জন্ম লাভ করে যা তাঁর অনন্য রচনাবলীর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

দশ. যোগ্য ও দক্ষ সঙ্গী-সাথী ঃ ইবনু হাজারের যাঁরা সঙ্গী-সাথী ছিলেন, তাঁরা 'ইলম, দীনদারী, ভদ্রতা, বিনয়, আমানতদারী সহ সকল দিক থেকেই উন্নত ছিলেন। তারা কোন প্রকার মানবিক অসৎগুণাবলীর দোষে দোষী ছিলেন না। তাঁদের প্রত্যেকের মধ্যে জ্ঞান চর্চা, জ্ঞানের বিকাশ এবং জ্ঞানের জগতে পর্যাপ্ত দক্ষতা অর্জনের অদম্য আগ্রহ ছিল। ফলে তাঁরা সর্বদাই লেখা-পড়া ও এতদসংক্রান্ত বিষয় নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। তাঁরা সকলেই পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেন। কারো প্রতি কার্পণ্য, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি পোষণ করতেন না। তাই ইবনু হাজারের জ্ঞানের প্রশস্ততার ক্ষেত্রে তাঁদেরও আসামান্য অবদান ছিল[৫৫]।

ইবনু হাজারের অনন্য রচনা ফাতহুল বারী ঃ

হাফিয ইবনু হাজার সাধারণভাবেই সাহীহুল বুখারীর ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই তিনি এই অনন্য হাদীছ গ্রন্থটির সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক বই রচনা করেছেন। সাহীহুল বুখারীর সাথে সংশ্লিষ্ট তাঁর লেখা বইগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ

---

(৫৫) প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৯)

'হাদ্ইস সারী' (هدي الساري), 'তাগলীকুত তা'লীক' (تغليق التعليق), 'আততাশভীক' (التشويق), 'আত তাওফীক' (التوفيق), 'তাজরীদুত তাফসীর মিন সাহীহিল বুখারী' (تجريد التفسير من صحيح البخاري), 'ছুলাছিয়্যাতুল বুখারী' (ثلاثيات البخاري), 'শারহুন কাবীরুন লিল বুখারী' (شرح كبير للبخاري) ও ফাতহুল বারী বিশারহি সাহীহিল বুখারী' (فتح الباري بشرح صحيح البخاري)। এ কারণে তিনি সাহীহুল বুখারী সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেন এবং বাস্তবিকই তিনি সহীহুল বুখারীর উপযুক্ত মূল্যায়নকারী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি ৮১৭ হিজরী সনে ফাতহুল বারী লেখার কাজ শুরু করেন। প্রথম দিকে ইমলার পদ্ধতিতে শুরু করলেও পরবর্তীতে খাতা-পত্রে লেখা শুরু করেন। অতঃপর এক দল যোগ্য 'আলিম মূল কপি থেকে নকল করেন এবং সপ্তাহের কোন এক দিন মূল কপির সাথে মিলিয়ে পাঠ করেন। এভাবেই যত্ন ও সতর্কতার সাথে ফাতহুল বারী লেখা হয় এবং ৮৪২ হিজরীর রজব মাসে তিনি লেখার কাজ সমাপ্ত করেন। তবে মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পূর্বে তিনি এর সংযোজনের কাজ শেষ করেন[৫৬]।

ইবনু হাজার তাঁর ফাতহুল বারীতে সহীহুল বুখারীর সমস্ত হাদীছ, হাদীছের অংশগুলো এবং হাদীছের শব্দের পার্থক্য এবং একটি শব্দ আরেকটি শব্দের কিভাবে পরিপূরক হয় ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেছেন। সহীহুল বুখারীর সনদ ও রাবীদের নিয়ে যে সব অভিযোগ তোলা হয়েছে তিনি সেগুলোর জবাব দিয়েছেন। ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমা'ঈল আল বুখারী (মৃ. ২৫৬ হি.) তাঁর সহীহ গ্রন্থে সনদ বর্ণনা এবং তাঁর ফিকহী ও ভাষাগত মতামত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কি নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তারও বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর তা'লীকাত (সনদ বিহীন হাদীছ), সহীহুল বুখারীর কপিগুলোর অসঙ্গতি, কতিপয় শব্দ নিয়ে রাবীদের মতানৈক্য, শব্দের ভুল, সনদ সংক্রান্ত সংশয় নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং রাবীদের পক্ষে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করেছেন। তাছাড়া সাহাবী ও তাবে'ঈগণের মতামত পেশ করার ক্ষেত্রে ইমাম আল বুখারী কি নিয়ম-নীতির অনুসরণ করেছেন তার বর্ণনা দিয়েছেন। কুরআনের কঠিন ও অপরিচিত শব্দগুলোর ব্যাখ্যা করেছেন। সাহাবীদের মুরসালাত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। একই হাদীছ বারবার উল্লেখ করার কারণ বর্ণনা সহ এ ক্ষেত্রে ইমাম আল বুখারীর সূক্ষ্ম দৃষ্টি তুলে ধরেছেন। পরিচ্ছেদের শিরোনামের সাথে উপস্থাপিত হাদীছের সম্পর্ক তুলে ধরার পাশাপাশি

(৫৬) ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১৩/৫৪৬, 'আব্দুস সাত্তার, হাফিয ইবনু হাজার আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীছ ৪৯২।

যাদের নিকট বিষয়টি অস্পষ্ট হওয়ার কারণে সমালোচনা করেছেন তাদের জবাব দিয়েছেন। শিরোনামের ধারাবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে ইমাম আল বুখারীর পারদর্শিতা এবং একই পরিচ্ছেদের অধীনে হাদীছগুলোর তারতীব নিয়েও ইবনু হাজার কথা বলেছেন।

অপরদিকে সহীহুল বুখারীর হাদীছগুলোর শারহ ও ব্যাখ্যা পেশ করার ক্ষেত্রে তার নীতি-পদ্ধতির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তিনি অত্যন্ত সুনিপুণভাবে হাদীছের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। সহীহুল বুখারীর অন্যান্য ভাষ্যকারদের সন্দেহ-সংশয় নিরসন করে জবাব দিয়েছেন। সহীহুল বুখারীর রিজাল শাস্ত্র ও তাঁদের বর্ণিত হাদীছগুলোর অস্পষ্টতা দূর করেছেন। সমস্যাপূর্ণ নামের রাবীদের নামগুলোকে যথাযথভাবে পেশ করেছেন। এবং জারহ ও তা'দীলের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের মান নির্ণয় ও তাঁদের মৃত্যু সন তারিখ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো বর্ণনা করেছেন। সহীহুল বুখারীতে পরস্পর বিরোধী বলে মনে হয় এমন বিশুদ্ধ হাদীছগুলোর মধ্যে অথবা বুখারীর হাদীছ ও অন্যান্য হাদীছগ্রন্থে সংকলিত হাদীছগুলোর মধ্যে অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হলে সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় করেছেন। ফিকহী মাসআলার মতবিরোধ তুলে ধরে অগ্রাধিকারযোগ্য মতামতের পক্ষে দলীল প্রমাণ পেশ করেছেন এবং অপর মতামত কেন অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য নয় কোন প্রকার গোঁড়ামী ও অস্পষ্টতার আশ্রয় না নিয়ে নিরপেক্ষভাবে তাও তুলে ধরেছেন। তিনি সুনিপুণভাবে প্রমাণ নির্ভর ফিকহী মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন। তিনি কোন সহীহ হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করতেন না। হাদীছের ব্যাখ্যা হাদীছ দ্বারা করাকেই তিনি উত্তম মনে করতেন।

সহীহুল বুখারীর কোন অসম্পূর্ণ হাদীছকে অন্যান্য হাদীছগ্রন্থের বর্ণনা দিয়ে পূর্ণাঙ্গ করার চেষ্টা করেন। হাদীসের সূক্ষ্ম দিকের বর্ণনা দেয়া সহ প্রতিটি হাদীছের শিক্ষাও তুলে ধরেছেন। হাদীছের মতন ও সনদে কোন প্রকার সংশয় থাকলে তা নিরসন করেছেন। 'ইলমুল হাদীছ, উসূলুল ফিকহ এবং এগুলোর পরিভাষা নিয়েও আলোচনা করেছেন।

আরবী ভাষাগত বিষয় নিয়েও সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। কুরআনের আয়াতগুলোর তাফসীর, শানে নুযুল, ই'জাযে কুরআন, 'ইলমুল ক্বিরাআত নিয়েও সারগর্ভ আলোচনা পেশ করেছেন। হাদীছে উল্লেখিত স্থানগুলোর ব্যাপারে কথাবার্তা বলেছেন। হাদীছের সাথে সংশ্লিষ্ট ইতিহাস তুলে ধরা, বংশ বিষয়ে যাচাই বাছাই এবং সীরাতের উপরও অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। অধিকন্তু চিকিৎসা বিষয়ক হাদীছগুলো ব্যাখ্যা করার সময় এ শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞদের মতামতের সারমর্ম অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন। তাছাড়া

তিনি তাঁর এ গ্রন্থে ইসলামের বাতিল ফিরকাহ, ভ্রান্ত দল এবং বিদ'আতপন্থীদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাদের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ 'আলিমদের মতামত তুলে ধরেছেন। এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'য়াতের 'আকীদার পক্ষে দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করে তাঁদের পক্ষাবলম্বন করেছেন।

এ সব কিছু প্রমাণ করে যে, সত্যই হাফিয ইবনু হাজার ইসলামী জ্ঞানের জগতে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। তাঁর সুলিখিত কিতাব 'ফাতহুল বারী' সত্যিই আল্লাহর পক্ষ থেকে বিকশিত জ্ঞানের ফল্গুধারা, জ্ঞানের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। স্বক্ষেত্রে অতুলনীয়।

ফাতহুল বারী সম্পর্কে 'আলিমগণের মন্তব্য ঃ

হাফিয ইবনু হাজারের এ অনন্য গ্রন্থটি সমকালীন 'আলিমগণ, তাঁর সুযোগ্য শিষ্যগণ এবং পরবর্তী বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক উচ্ছসিত প্রশংসা কুড়িয়েছে। উদাহরণ হিসেবে কতিপয় ব্যক্তির মন্তব্য নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

এক. 'আল্লামা শরফ উদ্দীন ই'য়াকুব বিন জালাল আল হানাফী (মৃ. ৮২৭ হি.) বলেন ঃ "ফাতহুল বারী একটি উত্তম শারহের কিতাব। যেখানে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানের সমাহার ঘটেছে। আমি এ কিতাবটি পাঠ করে অনেক উপকার পেয়েছি"(৫৭)। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, এ ব্যক্তি ফাতহুল বারী লেখা সমাপ্ত (৮৪২ হি.) হওয়ার অনেক আগেই মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি এ কিতাবের অংশ বিশেষ পাঠ করেই এমন মন্তব্য করেছেন। যদি পুরো কিতাব পড়ার সুযোগ হতো তাহলে কি মন্তব্য করতেন!

দুই. সিরিয়ার বিশিষ্ট ফাকীহ ও ইতিহাসবিদ 'আল্লামা ইবনু কাযী শুহবাহ (মৃ. ৮৫১ হি.) বলেন ঃ "ফাতহুল বারীর মতো এবং এর অনুসরণে আর কোন রচনা হয়নি"(৫৮)।

তিন. হাফিয জালাল উদ্দীন আস সুয়ূতী (মৃ. ৯১১ হি.) বলেন ঃ " ইবনু হাজারের সাহীহুল বুখারীর শারহের মতো কোন শারহ পূর্বেও কেউ লেখেনি এবং পরবর্তীতেও কেউ লেখেনি"(৫৯)।

চার. 'আল্লামা কাযী মুহাম্মাদ বিন 'আলী আশ শাওকানীকে (মৃ. ১২৫০ হি.) সাহীহুল বুখারীর শারহ লেখার জন্যে অনুরোধ করা হলে তিনি প্রসিদ্ধ একটি হাদীছ বলেন ঃ "لا هجرة بعد الفتح" অর্থাৎ ঃ "ফাতহ (মাক্কা) এর পরে আর

---

(৫৭) আস সাখাভী, আল জাওয়াহির ওয়াদ্দুরার, পৃঃ ২২৪।

(৫৮) প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৩

(৫৯) ইমাম আস সুয়ূতী, তাবাক্বাতুল হুফফায, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ), পৃঃ ৫৫২

হিজরাত নাই"[৬০]। এ উদ্ধৃতির মাধ্যমে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, 'ফাতহুল বারীর' পর সাহীহুল বুখারীর শারহ লেখার আর প্রয়োজন নাই[৬১]।
পাঁচ. 'আল্লামা আহমাদ হাসান আদ্দিহলভী বলেন ঃ "ফাতহুল বারীর মতো আর কেউ সাহীহুল বুখারীর শারাহ লেখেনি"[৬২]।

৫. সংস্কারক হিসেবে ইবনু হাজার ও তার চিন্তাধারাঃ

ক. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সাথে তার সম্পর্ক ঃ 'আকীদার ক্ষেত্রে ইবনু হাজার আল 'আসকালানী আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের তথা সালাফে সালিহীনের 'আকীদার অনুসারী ছিলেন। তিনি 'আকীদার মৌলিক, অমৌলিক ও শাখা-প্রশাখা নির্বেশেষে সকল ক্ষেত্রে ও সবিস্তারে সালাফী পদ্ধতির অনুসরণ করতেন। তিনি এ নিয়ম অনুসারেই সকল গ্রন্থাদিতে বিশেষ করে 'ফাতহুল বারীতে' আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'য়াতের 'আকীদা ও চিন্তাধারার পক্ষাবলম্বন করেন এবং বিরুদ্ধবাদীদের উপস্থাপিত নানা সন্দেহ সংশয়পূর্ণ যুক্তি-তর্কের জবাব দেন। তাঁর এই পদ্ধতি 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থের সকল স্থানেই বিশেষ করে কিতাবুত তাওহীদের ব্যাখ্যার সময় অধিকতর স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। নিম্নে কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলোঃ

১. তিনি কালাম শাস্ত্র (তর্ক শাস্ত্র) এবং এ শাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করা ও আলোচনা করাকে মোটেই সমর্থন করেননি। বরং প্রত্যাখ্যান করেন[৬৩]।
২. আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণের ক্ষেত্রে কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীছের নুসূসই যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে জ্ঞান ও যুক্তিগত দলীল প্রমাণের তেমন প্রয়োজন নেই। প্রমাণ হিসেবে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীদেরকে পেশ করেন যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দাওয়াত পেয়েই আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান পোষণ করেছেন[৬৪]।

---

(৬০) ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, সহীহুল বুখারী, ৩/১০৪০, বাব লা হিজরাতা বা'দাল ফাতহি।
(৬১) 'আব্দুস সাত্তার, ইবনু হাজার আল 'আসকালানী, আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীছ, পৃঃ ৫৭০।
(৬২) প্রাগুক্ত
(৬৩) ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, ১৩/২৫৩
(৬৪) প্রাগুক্ত, ১৩/৩৫৩

৩. আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নামগুলো চূড়ান্তভাবে স্থিরকৃত[৬৫]। কুরআনে নেই এমন কোন নাম আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করতে হলে দুটো শর্তের ভিত্তিতেই কেবল তা বৈধ। এক. নামটির মধ্যে যেন অপূর্ণাঙ্গতার কোন সুযোগ না থাকে। দুই. কুরআনে নামটির মূল শব্দটি থাকা[৬৬]। সুতরাং অপূর্ণাঙ্গতার সুযোগ আছে এ কারণে কুরআন কারীমে কোন নামের মৌলিক শব্দ থাকা সত্ত্বেও সে নামে আল্লাহর নামকরণ করা যাবে না। যেমন আল্লাহকে (مَاهِد، زَارِع، فَالِق، مَاكِر، بَنَّاء) ইত্যাদি নামে নামকরণ করা যাবে না। যদিও এগুলোর মূল শব্দ কুরআনে উল্লেখ আছে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী ঃ {فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ} (আয যারিয়াতঃ ৪৮), {أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ} (আল ওয়াক্বি'য়াহঃ ৬৪), {فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّـــوَى} (আল আন'আমঃ ৯৫), {وَمَكَرَ اللَّهُ} (আলে 'ইমরানঃ ৫৪), {والسماء بناها} (আশ শামসঃ ৫)[৬৭]।

৪. আল্লাহ তা'আলার সুন্দর সুন্দর গুণাবলীর ক্ষেত্রে ঐ গুণাবলীই কেবল প্রযোজ্য যেগুলো আল্লাহর কিতাব এবং সহীহ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে অথবা যেগুলোর ব্যাপারে ঐকমত্য আছে। যেমনঃ সত্তাগত গুণাবলীর মধ্যে জ্ঞান ('ইলম), শ্রবণ, দেখা, কথা, চেহারা, চক্ষু, হাত। আর কর্মময় গুণাবলীর মধ্যে সমাসীন হওয়া (ইসতিওয়া), অবতীর্ণ হওয়া (নুযূল), আসা ইত্যাদি[৬৮]।

৫. রাতের শেষ প্রহরে আল্লাহ সুবহানাহু প্রথম আসমানে নাযিল হন সম্পর্কিত বিভিন্ন মতামত তুলে ধরেন এবং সদৃশ স্থাপনকারী ও হাদীছটি বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে অস্বীকারকারী মু'তাযিলা ও খাওয়ারিজগণের মতামতকে প্রত্যাখ্যান করেন। তারপর নিজের অবস্থান তুলে ধরে বলেন ঃ " والتسليم أسلم كما تقـــدّم والله أعلـــم "অর্থাৎ পূর্বের মতোই আমি বলতে চাই যে, এ রকম বিষয়গুলোকে নিঃসংকোচে মেনে নেয়াই অধিক নিরাপদ"[৬৯]।

৬. কুরআন কারীম আল্লাহর কালাম, সৃষ্ট বস্তু নয়[৭০]।

---

(৬৫) প্রাগুক্ত, ৫/৩৩৬
(৬৬) প্রাগুক্ত, ১০/২০৭
(৬৭) আল ফাতহ ১১/২২৩
(৬৮) আল ফাতহ ১৩/৩৬২, ৩৬৮, ৩৭৩, ৩৭৭
(৬৯) আল ফাতহ ৩/৩০, ১৩/৪৬৮
(৭০) আল ফাতহ ১৩/৫৩২, ৫৩৩, ৪৫৫

৭. মু'তাযিলা ও চরমপন্থী সূফীদের বিভিন্ন মতামতের জবাব প্রদান করেছেন[৭১]।

৮. ইবনু হাজার এ কথা সাব্যস্ত করেন যে, গুনাহগার মুমিনদের ব্যাপারে আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামা'য়াতের মাযহাব হলো ঃ তারা তাদের অপরাধ অনুযায়ী জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে। তারপর জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি পাবে এবং যাদের অন্তরে এক শস্যদানা পরিমাণও ঈমান আছে বলে প্রমাণিত হবে তারা জাহান্নামে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে না[৭২]।

৯. জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানেও প্রস্তুত আছে। মু'তাযিলাদের এবং অন্যান্যদের মতে এ দুটোকে এখনো সৃষ্টি করা হয়নি। কিয়ামাত দিবসে সৃষ্টি করা হবে। ইবনু হাজার তাদের এ মতের জবাব দেন এবং তা প্রত্যাখ্যান করেন[৭৩]।

১০. ওলী, আওলিয়ার কারামত বিষয়ে ভারসাম্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন[৭৪]।

১১. নবীরা ছাড়া আর কারো 'ইসমাত বা নিষ্পাপ হওয়ার গুণ নেই[৭৫]।

১২. মৃত ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় সম্বোধন করা হবে। মৃত ব্যক্তি তা শুনতে পাবে। মানুষের শরীরে তার আত্মাকে পুনরায় ফিরিয়ে দেয়া হবে। ফেরেশতাদের প্রশ্ন মৃত ব্যক্তির শরীর ও আত্মা উভয়ের উপরই হবে[৭৬]।

১৩. কিয়ামাতের দিন মানুষের আমলকেই ওযন করা হবে[৭৭]।

ইবনু হাজারের আক্বীদাহ বিষয়ক কিছু দৃষ্টি আকর্ষণী ঃ

নিঃসন্দেহে ইবনু হাজার আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামা'য়াত এবং সালফ সালিহীনের 'আকীদাহর উপর ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাঁর ব্যাপক জ্ঞান সমৃদ্ধ শিক্ষার বিশাল ক্ষেত্রে নানা বিষয় নিয়ে কথা বলা, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা এবং মতামত প্রদান করতে গিয়ে ভুলের শিকারে পরিণত হওয়া বিচিত্র নয়। সে ধরনের কিছু বিষয় তাঁর লেখাগুলোতে লক্ষ্য করা যায়। তবে সে ক্ষেত্রেও কোন ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ আছে কিনা তাও পর্যালোচনায় স্পষ্ট হতে পারে।

---

(৭১) আল ফাতহ ১৩/৩৪৪
(৭২) আল ফাতহ ১/২২৬, ১২/২৫৯
(৭৩) আল ফাতহ ২/১৯, ৬/৩২০, ৩৩৩
(৭৪) আল ফাতহ ৭/৩৮৩
(৭৫) আল ফাতহ ১১/৩৪১, ৩৪৫
(৭৬) আল ফাতহ ২/২৩৫
(৭৭) আল ফাতহ ১৩/৫৩৯

হাফিজ ইবনু হাজার আল 'আসকালানী অনেক বড় মাপের 'আলিম হওয়ার কারণে পরবর্তী বিদ্যান ব্যক্তিবর্গ তাঁর 'ইলমের ভান্ডার থেকে উপকৃত হয়েছেন। বিশেষ করে তাঁর সুপ্রসিদ্ধ কিতাব বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা "ফাতহুল বারী" থেকে পরবর্তী যুগের 'আলিমগণ ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছেন। তবে মানুষ হিসেবে তিনি ভুল ক্রটির উর্ধে নন। তিনি কোন অবস্থাতেই নিস্পাপ ছিলেন না। তাঁর অন্যতম ক্রটি হলো তিনি কতিপয় বিষয় ও মাসআলাতে আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামা'য়াতের বিপরীতে আশ'আরী মাযহাবের অনুসরণ করেছেন[৭৮]। মজার ব্যাপার হলো যে, তিনি কোথাও কোথাও আশ'আরী মাযহাবের সমালোচনা করে সে বিষয়গুলোতে আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামা'য়াতের অনুসরণে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন[৭৯]।

ফাতহুল বারীতে ইবনু হাজারের 'আকীদাহ সংক্রান্ত ক্রটি সম্পর্কে শায়খ 'আলী বিন 'আব্দুল 'আযীয আশ শিবল এর 'আত্তাম্বীহ 'আলাল মুখালাফাতিল 'আকাদিয়্যাহ ফী ফাতহিল বারী' (التنبيه على المخالفات العقديـــة في فـــتح البـــاري) গ্রন্থ থেকে কিছু তথ্য জানা যায়। বর্তমান বিশ্বের অনেক সুপ্রসিদ্ধ মাশায়িখ এই কিতাবটি পাঠ করেছেন এবং এর প্রশংসাও করেছেন। তন্মধ্যে সৌদী আরবের বিশ্ব বরেণ্য শায়খ 'আব্দুল 'আযীয ইবনু বায (রহঃ), মুহাম্মাদ ইবনু 'উছাইমীন (রহঃ), ড. সালেহ আল ফাওযান, শায়খ আব্দুল 'আযীয আল রাজিহী, শায়খ আব্দুল্লাহ আল গুনাইমান রয়েছেন[৮০]। তাই কতিপয় 'আলিম কর্তৃক ইবনু হাজারের 'আকীদাহ বিষয়ক কোন কমতিকে অস্বীকার করা বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন চিন্তা। কেননা কোন কোন ক্ষেত্রে ইবনু হাজার আশ'আরী মাযহাবের অনুসরণ করেছেন। এর কতিপয় উদাহরণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন যে, "...فَيَأْتِيْهِمُ اللهُ فِيْ غَيْرِ الصُّوْرَةِ الَّتِيْ يَعْرِفُوْنَ فَيَقُوْلُ أَنَا رَبُّكُمْ". অর্থাৎ "... আল্লাহ তাদের নিকট অপরিচিত সুরতে আসবেন এবং বলবেন ঃ আমি

---

(৭৮) শায়খ 'আব্দুল 'আযীয আর রাজিহী, *'শারহুর রাদ্দি 'আলাল জাহমিয়্যাহ'*, ১/২০৬, শায়খ আল রাজিহী, *শারহুল 'আক্বীদাতিত তাহাভিয়্যাহ*, ১/৮৬, শায়খ সাফরুল হাওয়ালী, শারহুল 'আক্বীদাতিত তাহাভিয়্যাহ , ১/৯৭১, শায়খ আব্দুর রহমান ইবনু জিবরীন, ই'তিক্বাদু আহলিস সুন্নাহ, ২/৬।

(৭৯) যেমনঃ 'ফাতহুল বারী'র ১/৭১, ৪/১৩৫, ৬/২৯০, ৭/৪০৯ ইত্যাদি পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৮০) 'আলী আশ শিবল, 'আত্তাম্বীহ 'আলাল মুখালাফাতিল 'আক্বাদিয়্যাহ ফী ফাতহিল বারী, ভূমিকা লেখেছেনঃ শায়খ 'আব্দুল 'আযীয ইবনু বায (রহঃ), ড. সালেহ আল ফাওযান প্রমূখ, ১/ ১২।

তোমাদের রব..."[৮১]। ইবনু হাজার (রহঃ) বলেনঃ এখানে "আল্লাহর আসা" অর্থ মুমিনগণ তাকে দেখবেন। এখানে রূপকভাবে 'আসা' শব্দটিকে 'দেখার' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে"। আশ'আরীগণ আল্লাহ তা'আলার সাতটি গুণ ছাড়া অন্য কোন গুণকে স্বীকার করে না। তাই যে সব দলীল আল্লাহ তা'আলার অন্যান্য গুণ প্রমাণ করে এমন দলীলগুলোকে তারা তা'বীল ও ব্যাখ্যা করেন যাতে করে উল্লেখিত গুণটি আল্লাহর জন্যে প্রমাণিত না হয়। আলোচিত সহীহ হাদিছটিতে আল্লাহর জন্য 'আসা' গুণটি প্রমাণিত হয় বলে তারা 'আসা' শব্দটিকে এর স্পষ্ট প্রকৃত অর্থকে গ্রহণ না করে রূপকভাবে 'দেখার' অর্থে গ্রহণ করেন। ইবনু হাজার এ হাদীছের ব্যাখ্যায় আশ'আরীদেরই অনুসরণ করেছেন[৮২]।

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীঃ "فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ ... فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ" অর্থঃ অতঃপর আল্লাহ তাকে লজ্জা করেছেন ... আল্লাহ তাকে এড়িয়ে গেছেন"([৮৩])। এর ব্যাখ্যায় ইবনু হাজার বলেনঃ "অর্থাৎ অতঃপর তার প্রতি রহমত করেছেন ... তার উপর রাগ করেছেন"[৮৪]। এখানে আল্লাহর জন্যে (استحيا) 'লজ্জা' এবং (أعرض) 'এড়ানো' গুণ দুটি যাতে প্রমাণিত না হয় সে কারণে আশ্'আরীদের মতো এ শব্দ দুটির প্রকৃত অর্থকে পাশ কাটিয়ে রূপক অর্থ গ্রহণ করেছেন।

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীঃ "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّه يُنَاجِيْ رَبَّه" অর্থাৎ "তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন সে তাঁর রবের সাথে কথা বলে"[৮৫]। এ হাদীছের ব্যাখ্যায় ইবনু হাজার বলেনঃ "মুনাজাত শব্দটি বান্দার ক্ষেত্রে এর প্রকৃত অর্থই বহন করে। আর আল্লাহর ক্ষেত্রে অবশ্যই রূপক অর্থে ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ বান্দার সাথে আল্লাহর মুনাজাত অর্থ তাঁর প্রতি আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টি"[৮৬]। এখানে "মুনাজাত" গুণটি আল্লাহর জন্যে যাতে প্রযোজ্য না হয় তাই তিনি আশ্'আরীদের

---

(৮১) সহীহুল বুখারী , সম্পাদনাঃ ড. মোস্তফা, (বৈরুতঃ দার ইবনু কাছীর, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৭), ৫/২৪০৩।
(৮২) ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, ১১/৪৫০।
(৮৩) হাদীছটি আবু ওয়াক্বিদ আল লাইছী থেকে বর্ণিত। সহীহুল বুখারী, কিতাবুল ইলম, ১/২৬।
(৮৪) ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, ১/ ১৫৭।
(৮৫) সহীহুল বুখারী, কিতাবুস সালাত, ১/১৫৯।
(৮৬) ইবনু হাজর, ফাতহুল বারী ১/৫০৮।

অনুসরণে এর ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন, যা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'য়াতের অনুসৃত নীতির পরিপন্থী। এ রকম আরো উদাহরণ তাঁর রচনাগুলোতে রয়েছে(৮৭)।

ইবনু হাজার আশ'আরী ছিলেন না ঃ

ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) তাঁর "দারউ তা'আরুযিল 'আকল' ওয়ান নাকল" (دَرْءُ تَعَارُضِ الْعَقْلِ وَالنَّقل) গ্রন্থে এমন আলিমগণের নাম উল্লেখ করেছেন যে, তাঁরা হাদীছ ও আছারসমূহকে ভালবাসেন এবং হাদীছকে আঁকড়ে ধরেন। অথচ তাঁরা মুতাকাল্লিমুন বা তর্কবিদদের বেশ কিছু উসূল ও নীতিমালার সাথে একমত পোষণ করেছেন, এ সব ক্ষেত্রে তাঁদেরকে অনুসরণ করেছেন এবং সুধারণা বশতঃ তাদের উসূলগুলিকে সঠিক বলে অনুমান করেছেন। তাছাড়া হাফিয ইবনু হাজারের 'লিসানুল মীযান' (لسان الميزان) সহ অন্যান্য 'আল জারহ ওয়াত্‌তা'দীল' (الجرح والتعديل) গ্রন্থগুলোতে কোন ব্যক্তির জীবনী লিখতে গিয়ে তাঁর সম্পর্কে এমন কথা বলা হয়ে থাকে যে, তিনি তাঁর কতিপয় গ্রন্থে মু'তাযিলাদের সাথে অথবা খারিজীদের কোন মতামতের সাথে একমত পোষণ করেছেন। এতদসত্ত্বেও তাঁকে মু'তাযিলী বা খারিজী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়নি। একই পদ্ধতি যদি হাফিয ইবনু হাজার, ইমাম নববী এবং তাঁদের মতো আর যাঁরা আছেন তাঁদের বেলায় প্রণিধান করি তা হলে তো তাদেরকে আশ'আরী বলা বা আশ'আরী মাযহাবের অনুসারী বলা সঙ্গত হয় না। বড় জোর বলা যায় যে, তাঁরা কতিপয় বিষয়ে আশ'আরী মাযহাবের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। হাফিয ইবনু হাজারের ব্যাপারেও এ উক্তি প্রযোজ্য। তবে 'আক্বীদাহ সম্পর্কিত এ বিষয়গুলোকে পাঠকদের সামনে পরিষ্কার করে তুলে ধরা, তাদেরকে সতর্ক করা এবং এ সব মতামতের নেতিবাচক দিকগুলোকে স্পষ্ট করা অপরিহার্য। যাতে করে পাঠকগণ বিভ্রান্তির কবল থেকে মুক্ত থাকতে পারেন।

'আকীদাহ বিষয়ে ইবনু হাজারের পদ্ধতির উপর কতিপয় দৃষ্টি আকর্ষণী ঃ

১. প্রায় সকল জীবনী গ্রন্থ বিশেষ করে প্রাচীন গ্রন্থগুলোতে ইবনু হাজারের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর 'আকীদাহগত বিষয়টি সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তবে ইবনু হাজারের বিশিষ্ট ছাত্র হাফিয আস সাখাভী তাঁর "আল জাওয়াহির ওয়াদ দুরার" গ্রন্থে প্রসিদ্ধ সালাফী 'আলিম জামাল বিন 'আব্দুল হাদী থেকে একটি কথা উদ্ধৃত করেছেন যে, "শায়খ তাক্বী উদ্দীন

---

(৮৭) উদাহরণ স্বরূপ দ্রষ্টব্যঃ ফাতহুল বারী ১/২০৮, ৩৫২, ৫০৮, ৫১৪, ৩/৪৬৩, ৪/১০৫- ১০৬, ৬/৪০।

ইবনু তাইমিয়াহ ইবনু হাজারের প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁকে যথেষ্ট সম্মান করতেন এবং দীন ইসলামের মৌলিক বিষয়ে মুহাদ্দিছদের নিয়ম নীতির অনুসারী ছিলেন"[৮৮]।

২. ইবনু হাজারের সময় ছিল মামলূক সুলতানদের যুগ। এ সময় সূফী মতবাদ এবং পীর ওলীদের অসাধারণ পবিত্রতা, ভক্তি ও সম্মানের ধারণা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। ভ্রান্ত বিশ্বাস ও আক্বীদাহ চরম পর্যায়ে পৌঁছে। এ অবস্থা তুলে ধরে ইমাম ইবনু হাজার তাঁর "ইম্বাউল গামর"[৮৯] গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, সালাফী আকীদাহর উপর কোন কিতাব, যেমনঃ ইমাম আবু মুহাম্মাদ 'আব্দুল্লাহ আদ্দারিমীর (মৃ. ২৫৫ হি.) "আর রাদ্দু 'আলাল জাহমিয়্যাহ" পাঠ করাকে মুসলিম জামা'য়াতের আকীদাহ পরিপন্থী মনে করা হতো। তাকে আকীদাহর ক্ষেত্রে বিদ্রোহী হিসেবে অভিহিত করে কারারুদ্ধ করা হতো। তাছাড়া সে সময়ে কোন ব্যক্তি শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়ার মতামত গ্রহণ করলেও তাকে রীতি মতো নানা নির্যাতন ও দুঃখ-কষ্টের করুণ শিকারে পরিণত হতে হতো।

তাছাড়া ইবনু হাজার আরো উল্লেখ করেছেন যে, কবি 'আলী বিন আইবেক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যাপারে অতিরঞ্জন প্রশংসা করে যে কবিতা লিখেছিলেন, ইমাম সদর উদ্দীন ইবনু আবিল 'ইয আল হানাফী আদ্দিমাস্কী তার সমালোচনা করায় বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উসীলাহ করাকে কেন্দ্র করে তাকে কারারুদ্ধ করা হয়[৯০]।

৩. ইবনু হাজার এই প্রতিকূল অবস্থাতেও আশ'আরী মাযহাবের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছেন। তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "ফাতহুল বারীতে" অনুসন্ধান করে এ সম্পর্কে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

৪. ইবনু হাজার তাঁর বহু গ্রন্থে আশ'আরীদের সমালোচনা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ "ফাতহুল বারীর"[৯১] একটি বক্তব্য তুলে ধরা হলোঃ "উত্তম তিনটি যুগের পরের কিছু লোক (আশ'আরীদেরকে বুঝিয়েছেন) অনেক ক্ষেত্রেই এমন কিছু বিষয় সবিস্তারে বর্ণনা দিয়েছেন, যেগুলোকে তাবিঈন ইমাম ও তাঁদের সুযোগ্য অনুসারীগণ অস্বীকার করেছেন। কিন্তু তারা (আশ'আরীগণ) তাদের কথায় আশ্বস্ত হতে পারেননি। তাই তারা দীন ইসলামের

---

(৮৮) সূত্র ইন্টার নেট, মানহাজে ইবনু হাজার, পৃঃ ১, www. ibnamin.com

(৮৯) ইবনু হাজার, ইম্বাউল গামরি, ৪/২২২, ২২৩।

(৯০) ইম্বাউল গামরি, ২/৯৫ - ৯৬।

(৯১) ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১৩/২৫৩

বিষয়গুলোকেও গ্রীক দর্শনের সাথে একাকার করে ফেলেছেন। এবং যে সব হাদীছ ও আছার তাদের নীতিমালা ও চিন্তা ভাবনার বিপরীত হয় সেগুলোকে দর্শন শাস্ত্রের ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যাখ্যার অবতারণা করেন। শুধু তাই নয়, বরং তারা দাবী করেন যে, তারা যে উন্নত জ্ঞান ও 'ইলমের ভিত্তিতে নীতিমালা ঠিক করেছেন তা খুবই চমৎকার। যারা এ সব পরিভাষা ও নীতিমালার আশ্রয় নেবে না তারা মূর্খ ও জাহিল। অথচ বাস্তব কথা হলো উম্মাতের সালফ সালিহীনের পথ অনুসরণ ও আঁকড়ে ধরা এবং পরবর্তী লোকেরা (আশ'আরীগণ) যা নতুনভাবে আবিষ্কার করেছে তা পরিহার করার মধ্যেই প্রকৃত কল্যাণ রয়েছে"।

খ. ইবনু হাজারের সূফী চিন্তাধারার সংস্কার ঃ ইসলামী জীবন ধারায় সূফীবাদ একটি উল্লেখযোগ্য দর্শন। মূলতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের যুগে এ দর্শনের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এ কারণেই বিষয়টি বহুল বিতর্কিত। এ দর্শনের মাধ্যমে ইসলামের সঠিক 'আকীদাহ বিশ্বাসের মধ্যে অনেক অসঙ্গতি, বিভ্রান্তি, অতিরঞ্জন, চরম পন্থা এমন কি শিরক ও বিদ'আতের মতো ঈমান সংহারক পদ্ধতির অনুপ্রবেশ ঘটে। মূলতঃ এর উৎপত্তি গ্রীক, রোমান, পারশিয়ান এবং ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ ইত্যাদি দর্শনের সংমিশ্রণ থেকে। তাই এ সূফীবাদ ও এর চিন্তা দর্শন নিয়ে বিজ্ঞ 'আলিমগণ যথাযথ ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের অন্যতম আলোচিত বিজ্ঞ মহামান্য শায়খ হাফিয ইবনু হাজার আল'আসকালানী। তিনি সূফী চিন্তাধারা ও মতবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে এ ক্ষেত্রে সংস্কার করেছেন। নিম্নে বিভিন্ন বিষয়ে সূফী মতবাদ ভিত্তিক ভ্রান্ত বিষয়ের বিরুদ্ধে তার অবস্থানের কতিপয় উদাহরণ তুলে ধরা হলোঃ

১. ফানা ফিল্লাহ ও আল্লাহর মধ্যে মিশে যাওয়া ঃ সূফী দর্শনের চরমপন্থী কতিপয় শায়খ তাদের বিভ্রান্তিকর ও ইসলামী শরী'য়াতের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তারা কুরআন ও সুন্নাহর নুসূসকে তাদের বিশ্বাসের সপক্ষে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। ইসলামী শরী'য়ার বিজ্ঞ অনেক 'আলিম তাদের বক্তব্যকে সঠিকভাবে তুলে ধরে তা নিরসন করার চেষ্টা করেছেন। ইমাম ইবনু হাজার তাদের অন্যতম। তাদের বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যার অন্যতম উদাহরণ হলো ইমাম আল বুখারী কর্তৃক আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীছে জিবরীল নামে প্রসিদ্ধ হাদীছটি। তা হলো ঃ

"كَانَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ، فأَتَاهُ جِبْرِيْلُ ...قَالَ: مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ...".

"একদা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগণের সামনে ছিলেন। তখন তার নিকট জিবরীল আসেন ... জিজ্ঞাসা করেন ঃ ইহসান কাকে বলে? তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তর দেন যে, তুমি আল্লাহর ইবাদাত এমনভাবে করবে, মনে হয় তুমি যেন তাকে দেখছো। বস্তুতঃ তুমি তাঁকে না দেখলেও তিনি নিশ্চয় তোমাকে দেখেন..."(৯২)।

সহীহুল বুখারীর বিখ্যাত ভাষ্যকার ইবনু হাজার বলেনঃ কতিপয় চরমপন্থী সূফী অজ্ঞতাবশতঃ এ হাদীছের বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। তারা বলেন ঃ এখানে ফানা ফিল্লাহ ও আল্লাহর সাথে মিশে যাওয়ার উচ্চ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। তাদের দৃষ্টিতে হাদীছের এ অংশের অর্থ হলো ঃ "যদি তুমি কোন কিছু না হও এবং এমনভাবে নিজের অস্তিত্ব বিলীন করে দাও যে, তোমার যেন কোন অস্তিত্বই নেই, তখন তুমি তাঁকে দেখতে সক্ষম হবে"। ইবনু হাজার বলেনঃ " আরবী ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিটি জানে না যে, এখানে যদি তার বলা মতো অর্থ হতো তা হলে বাক্যের গঠন "فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاه" এ ভাবে না হয়ে "فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَه" অর্থাৎ শেষে আলিফ থাকতো না। কারণ দাবী অনুসারে তখন "تَـــرَه" শর্তের জওয়াব হওয়ার কারণে مَجْـــزُوم মাজযুম হতো। সে ক্ষেত্রে আলিফ অবশিষ্ট থাকার কোন সুযোগ নেই। এ হাদীছের কোন বর্ণনাতেই আলিফ বিহীন বর্ণনা নেই। নাহু শাস্ত্রের নিয়ম ভঙ্গ করারও কোন উপযুক্ত কারণ এখানে নেই। অধিকন্তু এ বক্তব্যকে যদি সঠিক বলে গণ্য করা হয়, তাহলে তার পরবর্তী বাক্য (فَإِنَّه يَـــرَاكَ)، অর্থহীন হয়ে পড়ে। কারণ তখন এ বাক্যটির পূর্বের বাক্যের সাথে কোন সম্পর্ক থাকে না(৯৩)।

২. রামাদান মাসের রোযা ৩০ দিন হওয়ার কারণ, এ দাবীর প্রত্যাখ্যান ঃ ইবনু হাজার রহ. আরো বলেন ঃ "কতিপয় সূফী উল্লেখ করেছেন যে, আদম (আ.) যখন গাছ খেয়ে তাওবা করেন, তখন তার তাওবা কবুল হতে বিলম্ব হয়। কারণ তার শরীরে ৩০ দিন পর্যন্ত ঐ খাবারের প্রতিক্রিয়া বলবৎ ছিল। এ খাদ্য থেকে তার শরীর যখন পবিত্র হয় তখন তার তাওবা কবুল করা হয়। এ কারণে আদম সন্তানদের উপর ৩০ দিন রোযা ফরয করা হয়েছে। এ ধরনের দাবীর পিছনে

---

(৯২) সহীহুল বুখারী, কিতাবুল ঈমান।
(৯৩) ফাতহুল বারী, ১/১২০।

গ্রহণযোগ্য দলীল প্রমাণের প্রয়োজন হবে। কিন্তু এ রকম দলীল পাওয়া প্রায় অসম্ভব"[৯৪]।

৩. সূফী মতবাদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মহান আল্লাহর বাণীঃ {ولكن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} **"তবে আমার অন্তরের প্রশান্তির জন্যে" (আল বাকারাহঃ ২৬০) এ আয়াতাংশের তাফসীর প্রত্যাখ্যান করেনঃ** এ প্রসঙ্গে **ইবনু হাজার** রহ. বলেনঃ "ইবনুততীন কতিপয় 'অপরিপক্ক বিদ্যান ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যে, "আমার অন্তর বলতে বুঝানো হয়েছে তার সঙ্গী জনৈক সৎব্যক্তিকে, যিনি তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। এর চেয়ে মুফাসসির আলকুরতুবী কতিপয় সূফীর বরাতে যে তাফসীর উল্লেখ করেছেন তা অধিকতর অগ্রহণযোগ্য। বিষয়ের সাথে এ তাফসীরের দূরতম সম্পর্কও নেই। তাহলো ইবরাহীম (আ.) তার রবের নিকট এই প্রার্থনা করেছিলেন যে, অন্তর সমূহকে কিভাবে জীবিত করা হয় তা যেন তাকে দেখানো হয়"[৯৫]।

৪. গান ও নৃত্যের বৈধতা প্রত্যাখ্যানঃ সূফীদের নিকট নৃত্য ও গান দুটি প্রসিদ্ধ বিষয়। বর্তমান সময়ের সূফীগণ এবং সূফী মতবাদগুলো এ দুটি বিষয় থেকে খুব কমই মুক্ত রয়েছে। এ ক্ষেত্রে পীর দরবেশ এবং তাদের মুরীদগণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সকলেই গান ও নৃত্য করে থাকেন। তারা শরী'আতের অবজেকটিভ সঠিকভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম না হওয়া এবং এর দলীল প্রমাণাদির প্রতি ভ্রান্ত ধারণা ও ভুল দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই গান ও নৃত্যকে বৈধ বলে মনে করে থাকেন। বস্তুতঃ কোন বিষয়ে মানুষের ধারণা অনুপাতেই সে বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত হয়। সুতরাং সূফীদের নিকট গান বৈধ হওয়ার প্রথম কারণ হলো আরবী ভাষা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা। দ্বিতীয় কারণ হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছের বিভিন্ন বর্ণনার পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব।

তাদের নিকট গান বৈধ হওয়ার প্রমাণ হলো ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত আয়িশা (রা.) এর হাদীছ। তিনি বলেন ঃ

"دَخَلَ عَلَيَّ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِندِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثٍ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَدَخَلَ أبو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي، وقَالَ: مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى

---

(৯৪) প্রাগুক্ত, ৪/১০২।

(৯৫) ফাতহুল বারী, ৬/৪১২।

الله عليه وَسَلَّمَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: دَعْهُمَا! فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا، وَكَانَ يَوْمَ عِيْدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرْقِ وَالْحِرَابِ فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عَلَيهِ وَسَلَّم، وَإِمَّا قَالَ: تَشْتَهِيْنَ تَنْظُرِيْنَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ! فَأَقَامَنِيْ وَرَاءَه، خَدِّي عَلَى خَدِّهِ وَهُوَ يَقُولُ: دُوْنَكُمْ يَا بَنِيْ أَرْفِدَةَ حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ، قَالَ: حَسْبُكِ، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَاذْهَبِيْ".

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট প্রবেশ করেন তখন আমার নিকট দুজন মেয়ে বু'আছ যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট গান করছিল। তিনি বিছানার উপর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়েন। তারপর আবু বকর প্রবেশ করেন এবং ধমক দিয়ে বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট শয়তানের বাঁশি? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেনঃ তাদেরকে কিছু বলো না। অতঃপর তিনি অন্যমনস্ক হলে আমি দুজন মেয়েকে ইশারা করলাম তারা বের হয়ে গেল। সে দিনটি ঈদের দিন ছিল। হাবশীরা ঢাল ও লাঠি দিয়ে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা করছিল। হয়তো আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিলাম অথবা তিনি আমাকে বলেছিলেনঃ তুমি কি খেলা দেখার আগ্রহ করছো? আমি হ্যাঁ সূচক জবাব দিলাম। তিনি তখন আমাকে তার পিছনে দাঁড় করালেন। তার গালের উপর আমার গাল রাখা ছিল। তিনি তখন বলছিলেনঃ আরফাদার বংশধর! তোমরা তোমাদের খেলা চালিয়ে যাও। অতপর আমার দেখার সখ মিটে গেলে তিনি বলেনঃ তোমার কি যথেষ্ট হয়েছে? আমি হ্যাঁ বললাম। অতঃপর তিনি আমাকে চলে যেতে বললেন"(৯৬)।

এ হাদীছ দ্বারা একদল সূফী সাধক গান বৈধ হওয়া, বাদ্যযন্ত্র সহ বা বাদ্যযন্ত্র ছাড়া গান শোনা বৈধতার প্রমাণ পেশ করে থাকে। ইমাম ইবনু হাজার রহ. তাদের এ বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন ঃ "এ হাদীছের মধ্যেই বর্ণিত 'আয়েশার (রা.) সুস্পষ্ট বক্তব্য (وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ) অর্থাৎ "তারা গায়িকা নয়"এ কথাটি তাদের মতামত প্রত্যাখ্যাত হওয়ার জন্যে যথেষ্ট। প্রত্যক্ষ শব্দ দ্বারা যা বুঝার অবকাশ ছিল 'আয়েশা (রা.) নিজেই ব্যাখ্যা করে তা নেতিবাচক করে দিয়েছেন। কেননা উচ্চ স্বরে বলাকে গান বলা হয়। দীর্ঘ সূরের মূর্ছনা, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, উত্তেজক সূর লহরী, আবেগের আবেদন দিয়ে নানাভাবে ইঙ্গিতে ও ভঙ্গিতে অশ্লীলতার প্রকাশ করে যে গায় তাকেই কেবল গায়ক বলা হয়। শুধু মাত্র সূরের কারণে কোন কথাকে গান বলা হয় না । এ ধরনের ছন্দময় কথাগুলোকে

---

(৯৬) সহীহুল বুখারী ৪/৬, আল হিরাব ইয়াওমাল 'ঈদ

আরবগণ 'তারান্নুম' কিংবা 'হুদা' বলে আখ্যায়িত করে"। তিনি আরো বলেন ঃ উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা সূফীগণ যা আবিষ্কার করেছে তা হরাম হওয়ার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু কামনা–বাসনা অনেক ভাল মানুষের মনের উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এমনকি তাদের অনেককে দেখা যায় পাগল, উন্মাদ এবং ছেলে ছোকরাদের কর্মকান্ডের মতো আচরণ করে ফেলে। এমনকি তারা নৃত্য করা সহ অনেক প্রকার শারিরীক কসরৎ করে থাকেন এবং এ সব বাজে কাজগুলোকে সৎকাজ হিসেবে বিবেচেনা করেন এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশাও করেন"। ফলশ্রুতিতে তারা খারাপ অবস্থায় নিমজ্জিত হয়। নিঃসন্দেহে এ অপকর্মগুলো ধর্মত্যাগীদের আচরণ এবং কুসংস্কার পন্থীদের উক্তি"[(৯৭)]।

উপর্যুক্ত হাদীছকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেই একদল সূফী সাধক নৃত্য করা এবং বাদ্যযন্ত্র ও সঙ্গীত শ্রবণ করা জায়েয মনে করে। ইবনু হাজার তাদের এ মতামতকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, উল্লেখিত হাদীছে হাবশীদের খেলা-ধুলা করার উদ্দেশ্য এবং সূফীদের উদ্দেশ্যের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। বস্তুতঃ হাবশীগণ যুদ্ধের অনুশীলন করার লক্ষ্যে লাঠি ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে খেলা–ধুলা করেছিলেন। তাই এ হাদীছ দ্বারা কোন ভাবেই নৃত্য ও বাজে খেলা–ধুলাকে বৈধতা দেয়ার সুযোগ নেই[৯৮]।

৫. বিপদ মুক্তি কামনা করা আল্লাহ্ তা'আলার ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকার পরিপন্থী ঃ ইমাম বুখারী (রহ.) একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে যে, "অসুস্থ ব্যক্তির জন্যে এভাবে বলা বৈধ যে, আমি অসুস্থ! অথবা 'ও আমার মাথা!, কিংবা আমার কষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে"। এ বিষয়ে ইমাম ইবনু হাজার বলেন ঃ "সম্ভবতঃ ইমাম বুখারী এ পরিচ্ছেদে এভাবে শিরোনামটি করে বুঝিয়েছেন যে, আল্লাহর নিকট কোন কিছু চাওয়া দোষ নয়। এর মাধ্যমে ইমাম বুখারী সূফীদের ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করেছেন। কতিপয় সূফী মনে করে যে, বিপদ মুক্তির জন্যে দু'আ করা আল্লাহর নিকট নিরংকুশ আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁর ফায়সালাতে সন্তুষ্ট থাকার পরিপন্থী। তাই ইমাম বুখারী বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, আল্লাহর নিকট কোন কিছু চাওয়া নিষিদ্ধ নয় বরং এর মধ্যে অতিরিক্ত 'ইবাদাত রয়েছে। কেননা নিষ্পাপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

---

(৯৭) ফাতহুল বারী ২/৪৪।
(৯৮) প্রাগুক্ত, ৬/৫৫৩।

ওয়া সাল্লাম নিজেই এভাবে দু'আ করেছেন । আল্লাহ তা'আলা এ কারণে তার প্রশংসা করেছেন এবং এ 'দু'আ' করা সত্ত্বেও তিনি 'সবরের' উপরে আছেন বলে তার স্বীকৃতি দিয়েছেন"(৯৯) ।

৬.আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল (আস্থা) এর ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন ঃ হাফিয ইবনু হাজার (রহ.) বলেন যে, "আল কুরতুবী সহ অন্যান্য বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেছেন ঃ একদল সূফী সাধক বলেন যে, যার অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভয় ছাড়া আর কারো ভয় বিদ্যমান থাকে মহান আল্লাহর প্রতি তার 'তাওয়াক্কুল' বা ভরসা আছে বলে মনে করার কোন কারণ নেই। এমনকি তাকে যদি বাঘেও আক্রমণ করে তবুও ভীত হওয়া যাবে না। এমনকি রিয্‌কের জন্যে চেষ্টা করা ও জীবিকা নির্বাহের পথ অনুসন্ধান করাও তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী। কেননা আল্লাহ তা'আলা তার রিয্‌কের দায়িত্ব নিয়েছেন। বস্তুতঃ সূফীদের এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণাকে সর্ব সাধারণ 'আলিমগণ প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতির প্রতি আস্থাশীল থাকা এবং তার সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার ব্যাপারে সুদৃঢ় বিশ্বাস পোষণের মাধ্যমে তাওয়াক্কুল অর্জিত হয়। তবে প্রয়োজনীয় জীবিকা ও রিয্‌কের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত ও আদর্শ অনুসরণ করতে হবে। রিয্‌কের অন্বেষণ করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী মনে করে তার সুন্নাত ত্যাগ করার কোন সুযোগ নেই"(১০০) ।

৭. ইবনু হাজার সম্পর্কে কতিপয় দৃষ্টি আকর্ষণী ঃ মানুষ ভুল-ত্রুটির উর্ধে নয়। ভুলে যাওয়া বা ত্রুটিতে নিমজ্জিত হওয়া মানুষের স্বভাব প্রকৃতির সাথে জড়িত। ইসলামের অসাধারণ জ্ঞানী ব্যক্তিদেরও কোন কোন অবস্থায় ভুলের মধ্যে পতিত হওয়া কোন বিস্ময়কর বিষয় নয়। বরং অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয়। সে দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের আলোচিত ইসলামের ইতিহাসের এ স্বনামধন্য বিদ্যান ও জ্ঞানী ব্যক্তি হাফিয ইবনু হাজার আল 'আসকালানীর বিশাল ব্যক্তিত্বের বর্নাঢ্য জীবনের উল্লেখ করতে গিয়ে গবেষকগণের চোখে কিছু ভুল-ত্রুটি ধরা পড়েছে। তবে তা কোনভাবেই তার বিশাল জ্ঞানের পরিধিকে মোটেও সংকুচিত করে না। তার জ্ঞান সাগরের প্রশস্ততাকে সংকীর্ণ করে না। আমার এ অনুভূতিকে সামনে রেখেই নিম্নে তাঁর সম্পর্কে কতিপয় দৃষ্টি আকর্ষণী তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি।

---

(৯৯) ফাতহুল বারী ১০/ ১২৪।
(১০০) প্রাগুক্ত, ১১/৪০৯।

ক. হানাফী মাযহাবের ব্যাপারে ইবনু হাজারের ভূমিকা ঃ

হাফিয ইবনু হাজার শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তাঁর সময়কালে শাফি'ঈ মাযহাব ও হানাফী মাযহাবের মধ্যে প্রকট বিরোধ ছিল। ইবনু হাজারের লেখনীতেও মাযহাবী এ দ্বন্দ্বের প্রভাব পড়ে। বিশেষ করে তাঁর প্রসিদ্ধ প্রতিপক্ষ হানাফী ফাকীহ্ হাফিয বদর উদ্দীন আল 'আইনী (মৃ. ৮৫৫ হি.), যিনি একই সময়ে সহীহুল বুখারীর ব্যাখ্যা লেখেন, তাঁর সাথে ব্যক্তিগত বিরোধের ফলে শাফি'ঈ মাযহাবের প্রভাব তাঁর ওপর আরো প্রকট হয়। এ কারণে ইমাম বদর উদ্দীন আল 'আইনী তাঁর সহীহুল বুখারীর ব্যাখ্যায় ইবনু হাজারকে আক্রমণ করেন। প্রকৃতপক্ষে ইমাম আল 'আইনী ইবনু হাজারের চেয়ে হানাফী মাযহাবের অধিক সমর্থক ছিলেন।

ইবনু হাজারের লেখাগুলোতে বিশেষ করে "ফাতহুল বারীতে" তাঁর নীতি ছিল যে, তিনি কোন বিষয়ে হানাফী মাযহাবের মতের সমর্থন ও পক্ষের হাদীছ জ্ঞাতসারে সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছেদে আলোচনা না করে অন্য স্থানে আলোচনা করতেন। যাতে করে হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ এ হাদীছকে তাদের দলীল হিসেবে গ্রহণ করার সুযোগ গ্রন্থ থেকে না পায়। এ প্রসঙ্গে শায়খ 'আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ "আর রাফ'উ ওয়াত তাকমীল" গ্রন্থ থেকে ইবনু হাজারের উপর মুহাম্মাদ আনোয়ার শাহ কাশ্মিরীর একটি কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ "ইবনু হাজার তাঁর গবেষণাধর্মী আলোচনা থেকে হানাফীগণ মাছির ডানা তুল্য সামান্য উপকৃত হোক তা পছন্দ করতেন না। তবে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তারা উপকৃত হলে সেটা ভিন্ন কথা"। মুহাম্মাদ আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী ইবনু হাজার সম্পর্কে আরো বলেনঃ "তিনি সব সময় হানাফী মাযহাবের দুর্বল দিক অনুসন্ধান করতেন। হানাফীদের উপকারে আসতে পারে এমন কোন কথা তাঁর আলোচনায় অবতারণা করতেন না। তিনি এমন কিছু বলেন, যার বিপরীত দিকটি সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত আছেন। অথচ তাঁর মতো ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও বিজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে এমন আচরণ মানানসই নয়। আমি হাফিয ইবনু হাজারের প্রাপ্য মর্যাদাকে কোন ভাবেই খাট করে দেখতে চাইনা। তবে তাঁর সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছি তা সত্য ও বাস্তব, যা একজন গবেষকের জানা অপরিহার্য। আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করুন এবং তার ত্রুটিগুলোকে পুণ্যতে রূপান্তরিত করুন"[১০১]।

বস্তুতঃ হাফিয ইবনু হাজার তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ছিলেন। তাই তিনি কারো সমালোচনা করতে চাইলে, তার প্রতি কোন বিরাগভাজন মনোভাব প্রকাশ না

---

(১০১) প্রাগুক্ত, পৃঃ ২ - ৩

করেই পরোক্ষ ও সূক্ষ্মভাবে তা করতেন। এ ক্ষেত্রে তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে অন্য বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কি সমালোচনা করেছেন, তাঁদের কথাগুলোকে বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরতেন।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, হাফিয ইবনু হাজার আবু জা'ফর আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আত্‌তাহাভী (মৃ. ৩২১ হি.) এর জীবনী হাফিয ইমাম আয যাহাবী থেকে তাঁর "তাযকিরাতুল হুফফায" ও "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে নকল করেছেন। তাঁর অভ্যাস মতো হানাফী 'আলিমগণের জীবনী লিখতে গিয়ে ইশারা ইঙ্গিতে তাঁদেরকে উপহাস ও ঘায়েল করে উপস্থাপন করতেন। একই পদ্ধতি তিনি ইমাম আততাহাভীর ক্ষেত্রেও অবলম্বন করেছেন। তাঁকে কেউ যেন গোঁড়া হিসেবে আখ্যায়িত করতে না পারে, এ জন্যে তিনি হানাফী 'আলিমদের নিয়ে অন্যদের সমালোচনাকে কৌশলে তুলে ধরতেন। অথচ তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারীদের অনেক বড় বড় ভুলকেও পাশ কাটিয়ে যেতেন। এগুলোর পর্যালোচনা বা সমালোচনা করতেন না। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো তিনি ইমাম আহমাদ বিন আল হুসাইন আল বাইহাকীর (মৃ. ৪৫৮ হি.) ক্ষেত্রে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করেননি, যা করেছেন ইমাম আত্‌তাহাভীর ক্ষেত্রে। বস্তুতঃ ইমাম বাইহাকীও কট্টোর শাফি'ঈ ছিলেন, যেমন ইমাম আততাহাভী কট্টোর হানাফী ছিলেন[১০২]।

খ. শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়ার প্রতি ইবনু হাজারের বৈরী ভাব ঃ

হাফিয ইবনু হাজার যেমন অনেক 'আলিমদের জীবনী লিখতে গিয়ে তাঁদের সমালোচনা বা তাঁদের উপর আক্রমণ করেছেন, অনুরূপভাবে ইমাম তাকী উদ্দীন ইবনু তাইমিয়ার (মৃ. ৭২৮ হি.) উপরও আক্রমণ করেছেন। এর সমর্থনে অনেক প্রমাণ তাঁর গ্রন্থগুলোতে রয়েছে। বিশেষ করে ইবনু হাজারের "আদ্দুরারুল কামিনাহ" গ্রন্থে ইমাম ইবনু তাইমিয়ার অনেক সমালোচনা করেছেন এবং তাঁর সম্পর্কে প্রসিদ্ধ শি'য়া ইমামদের কটুক্তিকে তুলে ধরেছেন। উপরন্তু আল আকশাহরী নামক একজন অজ্ঞাত পর্যটকের বরাত দিয়ে তাঁর সম্পর্কে অনেক মিথ্যা কল্পকাহিনী রচনা করেছেন। "হাফিয ইবনু হাজারের জীবনী" এর সম্পাদক সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ 'আযীয বলেন ঃ "হাফিয ইবনু হাজার ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ সম্পর্কে আল আকশাহরী এবং অন্যদের বরাত দিয়ে যা কিছু লিখেছেন তা পূর্ববর্তী কিতাবাদিতে পাইনি। এমনকি শায়খ রহঃ লিখিত গ্রন্থাদিতেও এ কথাগুলোর কোন সমর্থন পাইনি। পর্যটক

---

(১০২) প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩

আল আকশাহরী থেকে হাফিয ইবনু হাজার ইমাম তাইমিয়াহ সম্পর্কে যা কিছু লেখেছেন তা শায়খের জীবনীর সম্পূর্ণ বিপরীত। হাফিয ইবনু হাজারের মতো লেখক এ ধরনের ভিত্তিহীন কথার গুরুত্ব দেবেন এটাই আশ্চর্যের বিষয়..."(১০৩)।

সম্ভবতঃ ইবনু হাজার তাঁর জীবনের শুরুতে সমসাময়িক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়ার প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁর এ মনোভাব ইবনু তাইমিয়ার জীবনী লিখতে গিয়ে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। "আদ্দুরারুল কামিনাহ" গ্রন্থে তিনি ইবনু তাইমিয়া সম্পর্কে অন্যদের বলা অনেক ভিত্তিহীন সমালোচনার অবতারণা করেছেন, যেগুলো মিথ্যা ও ভিত্তিহীন জানা সত্ত্বেও তিনি সেগুলোকে উল্লেখ করেছেন এবং এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে কোন সতর্ক করার প্রয়োজনও বোধ করেননি। মনে হয় যেন তিনি প্রচ্ছন্নভাবে অন্যের কথা দিয়ে শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াকে ঘায়েল করতে চেয়েছেন। তা না হলে তিনি তাঁকে ঘায়েল করা কথাগুলো উল্লেখ করতেন না। আবার উল্লেখ করলেও রদ না করে ছেড়ে দিতেন না। অনুরূপভাবে তিনি অন্যান্য গ্রন্থেও তাঁর কথা উল্লেখ করে তাঁকে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অপবাদে জর্জরিত করেছেন। তবে পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর এই দুঃখজনক অবস্থান থেকে সরে আসেন এবং শেষের দিকের গ্রন্থগুলোতে ইবনু তাইমিয়ার প্রশংসাও করেন। এ ক্ষেত্রে "ইবনু নাসির উদ্দীন" নামক বইয়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

ইবনু হাজার তাঁর লিখিত "লিসানুল মীযান ৬/৩১৯" গ্রন্থে শায়খুল ইসলাম সম্পর্কে বলেনঃ "আমি তাঁকে ইবনুল মুতাহ্হির (প্রসিদ্ধ শিয়া পন্ডিত, মৃ. ৮৯৫ হি.) কর্তৃক উপস্থাপিত হাদীছগুলোকে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে অত্যধিক বিদ্বেষী হিসেবে পেয়েছি। যদিও তাঁর অধিকাংশ হাদীছই জাল এবং মিথ্যা। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইবনু তাইমিয়ার হাদীছ মনে না থাকার কারণে তাঁর অনেক উত্তম হাদীছকেও প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ হিসেবে বলা যায় যে, ইবনু তাইমিয়া অনেক বেশি হাদীছ মুখস্ত করার ফলে নিজের মুখস্ত হাদীছগুলোর উপরই ভিত্তি করতেন। মনে রাখার প্রয়োজন ছিল যে, মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। এ কারণেই রাফিযী শী'য়া ব্যক্তির কথাকে বাড়াবাড়ি পর্যায়ের তুচ্ছ জ্ঞান করতে গিয়ে অনেক সময় তিনি 'আলী (রাঃ) এর মানহানি করেছেন"।

---

(১০৩) প্রাগুক্ত

ইবনু হাজারের এ ধরনের উক্তি নিঃসন্দেহে শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়ার প্রতি মিথ্যা অপবাদ। তিনি কোথায় 'আলী (রাঃ) এর সম্মানে আঘাত করেছেন? বরং তার লিখিত কিতাবগুলি 'আলী (রাঃ) ও তাঁর সন্তানদের প্রশংসা দ্বারা পরিপূর্ণ। বস্তুতঃ ইবনু হাজার এমন একটি হাদীছকেও উদাহরণ হিসেবে পেশ করতে পারবেন না, যে হাদীছকে ইবনু তাইমিয়াই কেবল দুর্বল বলেছেন, তাঁর পূর্বে আর কোন 'আলিম এ হাদীছটিকে দুর্বল হিসেবে আখ্যায়িত করেননি? তাই এ সংশয় পোষণের যথেষ্ট সুযোগ আছে যে, সম্ভবতঃ ইবনু হাজার কিছুটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই ইবনু তাইমিয়াকে আঘাত করার চেষ্টা করেছেন[১০৪]।

গ. শী'য়াদের প্রতি ইবনু হাজারের সহানুভূতি প্রকাশ ঃ

ইবনু হাজার একদিকে রাফিযী শী'য়া পন্ডিত ইবনুল মুতাহ্হিরকে কেন্দ্র করে শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াকে আক্রমণ করার চেষ্টা করেছেন। অপরদিকে ঐ শী'য়া ব্যক্তির প্রশংসা করেছেন। যে সর্বদা সাহাবীদেরকে গালাগাল করতো। ইবনু হাজার তাঁর "লিসানুল মীযান ২/৩১৭" গ্রন্থে বলেনঃ "হুসাইন বিন ইউসুফ ইবনুল মুতাহহির আল হিল্লী শী'য়াদের একজন বিশিষ্ট 'আলিম, ইমাম এবং লেখক। তিনি অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। ইবনুল হাজিবের মুখতাসার কিতাবটি তিনি অত্যন্ত সহজ ও সাবলীলভাবে সুন্দর ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর সুলিখিত পুস্তকাদি তাঁর জীবদ্দশায়ই ব্যাপক প্রচার লাভ করে। এ শী'য়া ব্যক্তিকে টার্গেট করেই শায়খ তাক্বী উদ্দীন ইবনু তাইমিয়া তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ (মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবীয়্যাহ ফিররাদ্দি 'আলাশ শী'য়াহ ওয়াল ক্বাদরিয়্যাহ, مِنهَاجُ السُّنَّة النَبوِيَّة فِيْ الرَدِّ عَلَى الشِيْعَةِ وَالْقَدْرِيَّةِ) লিখেছেন। ইবনুল মুতাহ্হির একজন প্রসিদ্ধ ও উত্তম চরিত্রের লোক ছিলেন। তাঁর নিকট ইবনু তাইমিয়ার কিছু কিতাব পৌঁছলে তিনি উক্তি করেন ঃ "আমি যা বলি তা যদি ইবনু তাইমিয়া বুঝতে সক্ষম হতেন তাহলে তাঁর কথার জবাব দিতাম"। অর্থাৎ রাফিযী ও শী'য়া পন্ডিতের কথা বুঝার মতো যোগ্যতা ইমাম ইবনু তাইমিয়ার নেই। নিঃসন্দেহে এ বাক্যের মাধ্যমে এ পন্ডিত ইমাম ইবনু তাইমিয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন।

ইবনু হাজারের মতো একজন বিজ্ঞ সঠিক 'আকীদাহ বিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে একজন শী'য়া ব্যক্তির এতটা প্রশংসা এবং তাঁর মুখে শায়খুল ইসলাম ইবনু

---

(১০৪) প্রাগুক্ত

তাইমিয়াকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার কথা তুলে ধরা শোভনীয় নয়। এটা নিঃসন্দেহে একটি খারাপ দিক।

ইবনু হাজার কেবল রাফিযী. শী'য়া ইবনুল মুতাহ্হিরের প্রশংসা ও স্তুতি গেয়েছেন তাই নয়, বরং তিনি শী'য়া সম্প্রদায়ের চরমপন্থী অনেকেরই প্রশংসা করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি স্পষ্ট করে আত্মতৃপ্তির সাথেই বলেছেন যে, তিনি এ সব ব্যক্তির জীবনী শী'য়াদের কিতাবাদিতে পাঠ করেছেন। তাই স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে যে, ইবনু হাজারের মতো বিজ্ঞ ব্যক্তি শী'য়াদের জীবনী লিখতে গিয়ে ইনসাফের মানদন্ড কোথায় রেখেছেন? তিনি শী'য়াদের মতো ভ্রান্ত দর্শনের লোকদের ভাল দিক তুলে ধরলেও তাদের মন্দ দিকটিও তুলে ধরা উচিৎ ছিল।

এতদসত্ত্বেও এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ইবনু হাজারের শী'য়াদের প্রতি এ ধরনের সহানুভূতি প্রকাশ পাওয়ার অর্থ এটা নয় যে, তিনি রাফিযী বা শী'য়াদের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলেন। এ কারণে শী'য়া 'আলিমদের কেউ কেউ ইবনু হাজারের প্রশংসাও করেছেন। পক্ষান্তরে হাফিয ইমাম আয যাহাবীর কঠোর সমালোচনা করেছেন। সে যাই হোক, এতদসত্ত্বেও ইবনু হাজার জ্ঞান, তাকওয়া এবং আল্লাহ ভীতির ক্ষেত্রে একজন স্বনামধন্য ইমাম, উঁচু মাপের 'আলিম ও গবেষক। মানুষ হিসেবে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি তাঁর সুউচ্চ মর্যাদার উপর কোন নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না। কারণ এ ধরনের কিছু অভিযোগ আরো স্বনামধন্য ব্যক্তি ও 'আলিমদের বিরুদ্ধে আছে। যেমন ইমাম আয যাহাবী, আবু নু'য়াঈম, আন নাসাঈ, ইবনু জারীর আততাবারী ও আল হাকিমের বিরুদ্ধেও শী'য়া মাযহাবের অভিযোগ রয়েছে। অনুরূপভাবে শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াও আল হাকিম, আন নাসাঈ ও ইবনু 'আব্দিল বারদের বিরুদ্ধে তাঁর "মিনহাজুস সুন্নাহ" গ্রন্থে শী'য়া 'আকীদাহর অভিযোগ এনেছেন। অথচ তারা প্রত্যেকেই ইবনু হাজারের তুলনায় সহীহ 'আকীদাহ এবং সালাফে সালিহীনের অধিকতর নিকটবর্তী ছিলেন।

ঘ. হাদীছ শাস্ত্রে ইবনু হাজারের অনুসৃত পদ্ধতি ঃ

হাদীছ শাস্ত্রে ইবনু হাজারের নিজস্ব নিয়ম-পদ্ধতি আছে। হাদীছ শাস্ত্রে তিনি নতুন নতুন কিছু পরিভাষা, বিশেষ করে তাঁর "নুখবাতুল ফিকর" গ্রন্থে আবিষ্কার করেছেন। এ কারণে অনেকেই তাঁকে দোষারোপ করেছেন। এখানে এ ধরনের প্রশ্ন তোলার বোধ হয় অবকাশ নেই যে, "পরিভাষা নিয়ে তো কোন বিতর্ক করার সুযোগ নেই"। তাই নতুন পরিভাষা হলে তাতে দোষের কি আছে? কথাটি যৌক্তিক হলেও এমন নতুন নতুন পরিভাষার আবিষ্কারের মধ্যে কি লাভ আছে, যা অতীতের ইমামগণের উক্তিতে ভুল

বুঝার অবকাশ সৃষ্টি করে এবং পরিভাষাগুলোর অর্থ ও সংজ্ঞার মধ্যে পরিবর্তন আসে। অতএব যে নতুন পরিভাষা কোন নতুন সমস্যার জন্ম দেয় তা পরিহার করাই যুক্তিযুক্ত।

ঙ. হাদীছের যাচাই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে শিথিলতা ঃ

"ফাতহুল বারী" গ্রন্থের সম্পাদক আবুল হাসান মুস্‌তাফা বিন ইসমাঈল "ইতহাফুন নাবীল বিআজওয়াবাতি আসইলাতিল মুসতালাহ ওয়াল জারহি ওয়াত তা'দীল ১/৪৫" (إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة المصطلح والجرح والتعـديل) গ্রন্থে বলেনঃ "বস্তুতঃ ইবনু হাজার হাদীছের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের এবং এ সম্পর্কে আলোচনা করার ক্ষেত্রে বেশি শিথিলতা প্রদর্শনের পক্ষে। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ চর্চা করতে গিয়ে এ বিষয়টি আমার নিকট অধিক স্পষ্ট হয়েছে। এ গ্রন্থে তিনি অনেক য'য়ীফ ও দুর্বল হাদীছকে উত্তম বা সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন"।

একই গ্রন্থের ১/১৫৬ পৃষ্ঠায় তিনি আরো বলেনঃ "ইবনু হাজার 'ফাতহুল বারীর" ভূমিকাতে বলেছেন যে, তিনি আল বুখারীর হাদীছগুলোর ব্যাখ্যা করতে যে সব হাদীছ উপস্থাপন করবেন এবং যেগুলো সম্পর্কে নীরবতা পালন করবেন সেগুলো সহীহ বা উত্তম। কিন্তু বাস্তবে তিনি তাঁর এ নীতিতে অটল থাকতে পারেননি। দেখা গেছে যে, তিনি অনেক হাদীছ নিয়ে কোন কথা বলেননি অথচ সেগুলো য'য়ীফ। বরং এমনও আছে যে, তিনি দুর্বল হাদীছকে স্পষ্টভাবে হাসান বলেছেন। আবার কোন কোন হাদীছ সম্পর্কে এ মন্তব্য করেছেন যে, হাদীছটি ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী। অথচ হাদীছটির মান হলো এটি একটি বিরল হাদীছ"।

হাদীছ শাস্ত্রে ইবনু হাজারের শিথিলতার প্রকারভেদ ঃ

১. তাবিঈগণের প্রতি বিশেষ করে প্রবীণ তাবিঈগণের প্রতি শিথিলতা।
২. সাক্ষাত হওয়ার ব্যাপারে যাচাই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে শিথিলতা। অথবা কারো নাম সাহাবীদের তালিকায় উল্লেখিত রয়েছে অথচ সাহাবী হওয়ার ব্যাপারে প্রামাণ্য দলীল নেই, তাদের ব্যাপারেও শিথিলতা প্রদর্শন।
৩. কারো সাহাবী হওয়ার ব্যাপারেই মতভেদ আছে, এমন ব্যক্তিদের ব্যাপারেও শিথিলতা প্রদর্শন করা। উল্লেখ্য যে, দুই ও তিন নম্বর বিষয়ে তাঁর "তাহ্‌রীরুত তাকরীব" গ্রন্থে স্পষ্ট উদাহরণ রয়েছে।
৪. তিনি হাদীছের মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে "মাকবুল" নামে একটি নতুন স্তর সৃষ্টি করেছেন। এখানকার অধিকাংশ রাবী অজ্ঞাত। তবে সত্যবাদীরাও রয়েছেন। তিনি পূর্বের কারো নিকট থেকে প্রমাণ না পেলে রাবী

"অজ্ঞাত" পরিভাষাটি পছন্দ করতেন না। এ কারণে তাঁদের ব্যাপারে শিথিলতা দেখাতেন।

৫. পরবর্তী 'আলিমগণের মতো বিভিন্ন সনদের সমষ্টির আলোকে অনেক হাদীছকে "উত্তম" কখনো কখনো "সহীহ" বলার ক্ষেত্রে শিথিলতা দেখাতেন। অথচ পূর্ববর্তী 'আলিমগণের নিকট "মুনকার" হাদীছ সর্বদাই "মুনকার" হিসেবে বিবেচিত।

৬. জাল হাদীছের ব্যাপারে হুকুম দেয়ার ক্ষেত্রে শিথিলতা। জাল হাদীছকেও তিনি "য'য়ীফ" হাদীছ বলে আখ্যায়িত করতেন।

৭. একদল আস্থাভাজন ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে "সাদূক" বা অত্যধিক সত্যপরায়ণ বলার ক্ষেত্রে ইবনু হাজার তাঁর "আত তাকরীব" গ্রন্থে কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। এ কারণে কতিপয় গবেষক এই বলে মন্তব্য করেছেন যে, ইবনু হাজার "সাদূক" পরিভাষাটিকে এ গ্রন্থে একটি স্বতন্ত্র পরিভাষা হিসেবে দেখতে চেয়েছেন[১০৫]।

চ. ইবনু হাজারের স্বনির্ধারিত নীতিমালার লংঘন ঃ

ইবনু হাজার "ফাতহুল বারীর ভূমিকাতে বলেছেন যে, সহীহুল বুখারীর শারহ ও ব্যাখ্যার সময় প্রয়োজন অনুসারে সহীহ বা উত্তম হাদীছগুলোকে পেশ করবেন[১০৬]। কিন্তু তিনি তাঁর এ কথার উপর বলবৎ থাকেননি। তিনি কোন কোন সময় দুর্বল হাদীছও উল্লেখ করেছেন অথচ এ বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ বা তাকে সতর্ক না করে নীরবতা পালন করেছেন। অন্য স্থানে আবার সে হাদীছটিকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমনঃ "ফাতহুল বারীর ১/৮ পৃষ্ঠায় " كل أمرٍ ذي بال لا يبدأ بحمد الله، فهو أقطع " অর্থাৎ "বড় গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ আল্লাহর প্রশংসা ব্যতীত শুরু করলে তা বরকতশূণ্য হয়"[১০৭], হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। এখানে হাদীছটির মানের ব্যাপারে নীরবতা পালন করেছেন। কিন্তু "ফাতহুল বারীর ৮/২২০ পৃষ্ঠায় হাদীছটিকে দুর্বল বলে চিহ্নিত করেছেন। একইভাবে "ফাতহুল বারীর ১/১১" পৃষ্ঠায় " نية "

---

(১০৫) প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮।

(১০৬) প্রাগুক্ত, ১/৪

(১০৭) আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। ইমাম মালিক, মুয়াত্তা ইমাম মালিক, সম্পাদনাঃ ড. ত্বাকী উদ্দীন নদভী (দামেস্ক, দারুল কলম, ১ম সংস্করণ ১৯৯১) খন্ড ১, পৃঃ ৪২ ।

" المؤمن خير من عملـه " অর্থাৎ "মুমিনের সদিচ্ছা তাঁর কর্মের চেয়ে উত্তম"(১০৮) হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। এর মান নিয়ে কোন মন্তব্য করেননি। কিন্তু একই কিতাবের ৪/২১৯ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদীছটিকে য'য়ীফ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ছ. ইবনু হাজারের স্ববিরোধী মতামত ঃ

ইবনু হাজারের প্রণীত নীতিমালার আরেকটি সমালোচনা যোগ্য বিষয় হলো তিনি অনেক সময় স্ববিরোধী সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ফাতহুল বারীর সম্পাদক আবুল হাসান মুস্তাফা তাঁর "ইতহাফুন্ নাবীল" গ্রন্থের ১/৪৬ পৃষ্ঠায় ইবনু হাজার সম্পর্কে বলেন ঃ "উদহারণ স্বরূপ তিনি কখনো তাঁর "আত তাক্বরীব" গ্রন্থে কোন ব্যক্তিকে 'সাদূক' বা অত্যন্ত সত্যবাদী বলে আখ্যায়িত করেন। আবার একই ব্যক্তিকে "আত্তাল্খীসুল হাবীর" গ্রন্থে 'অত্যন্ত দুর্বল' বা 'দুর্বল' বলে অভিহিত করেন। আমরা যদি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে যেমনঃ "আত্তাল্খীস", "আদ্দিরায়াহ" এবং "আল ফাতহ" গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত তাঁর কথাগুলোকে সমন্বয় করি তাহলে তাঁর এ কথাগুলোর সাথে "আত তাক্বরীবে" বর্ণিত একই বিষয়ের কথার মধ্যে অনেক জায়গাতেই গরমিল পাওয়া যায়"(১০৯)।

তাঁর স্ববিরোধী মতামতের বিষয়ে তখনই কেবল নিশ্চিতভাবে বলা যাবে, যখন এটা প্রমাণিত হবে যে, তিনি জেনে বুঝে প্রায় একই সময়ে লিখিত বইগুলোতে এমন এলোমেলো কথা বলেছেন। অন্যথায় এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না যে, তিনি তাঁর প্রাথমিক গবেষণা লব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে একটি গ্রন্থে এক রকম সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তীতে ব্যাপক অনুসন্ধান ও গভীর গবেষণার ফলে পূর্বের মত পরিবর্তন করে পরবর্তী সময়ে লিখিত গ্রন্থগুলোতে পরিবর্তিত সিদ্ধান্তের কথা লিখেছেন। তাই এ বিষয়টি একজন গবেষকের জন্যে দোষের পর্যায়ে পড়ে না।

সমকালীন 'আলিমদের মধ্যে তাঁর অবস্থান ঃ

'ইলমুল হাদীছের পাঠ, পঠন, লেখা এবং ফাতওয়ার ক্ষেত্রে ইবনু হাজার সমকালীন 'আলিমদের মধ্যে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি যে প্রচন্ড মুখস্ত শক্তির অধিকারী ছিলেন সে সাক্ষ্য তাঁর নিকটতম, দূরতম ব্যক্তিবর্গ সহ শত্রু এবং

---

(১০৮) সাহল বিন সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আততাবারানী, সোলায়মান বিন আহমাদ, আল মু'জামুল কাবীর, সম্পাদনাঃ হামদী বিন 'আব্দুল মাজীদ আস সালাফী (আল মুসিলঃ মাকতাবাতুল 'উলূম ওয়াল হিকাম, ২য় সংস্করণ ১৯৮৩), খন্ড ৬, পৃঃ ১৮৫।

(১০৯) সূত্র ইন্টার নেট, মানহাজে ইবনু হাজার, পৃঃ ৯, www. ibnamin.com

মিত্রগণও দিয়েছেন। এমন কি সকল 'আলিমের ঐকমত্যের ভিত্তিতেই তিনি 'হাফিয' হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর নিকট পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থীগণ বিদ্যা অর্জনের জন্যে আগমন করেন। তাঁর জীবদ্দশায়ই তাঁর লিখিত কিতাবগুলো ব্যাপক পরিচিতি পায় এবং বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি রাজা বাদশাহরা পর্যন্ত তাঁর লেখা বই পুস্তক নিয়ে নিজেদের মধ্যে লেখালেখি করতেন। কবিতা লেখাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর কবিতার উপর মধ্যম আকারের প্রকাশিত একটি কবিতার বইও আছে।

মৃত্যুকাল ঃ

ইবনু হাজার ৮৫২ হিজরী সনের জুমাদাল আখিরার ২৫ তারিখে বিচারকের পদ থেকে নিজেই ইস্তফা দেন। তিনি দীর্ঘকাল অসুস্থ ছিলেন। অতঃপর ৮৫২ হিজরী সালের যুলহাজ্ব মাসে মৃত্যুবরণ করেন। রোগ ব্যাধি তাঁকে এতটাই পর্যদুস্ত করে ফেলেছিল যে, তাঁর মেযাজের ভারসাম্য হারিয়ে যায়। ফলে তিনি মাসজিদে যাওয়া বন্ধ করে দেন এবং তার চলাফেরার অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হয়। তাঁর অসুস্থতার সময়ে খ্যাতিমান 'আলিমগণ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ঃ 'আল্লামা বদর উদ্দীন আল 'আইনী, আল বদর ইবনুত তানীসী প্রমূখ। তাঁর মৃত্যুতে মানুষেরা শোকে মুহ্যমান হয়ে যায় এবং তাঁর জন্যে অঝোর নয়নে কাঁদতে থাকেন। তাঁর জানাযায় বহু লোকের সমাগম হয়। জানাযার সময় বৃষ্টি হয়। বানু খাররুবী গোত্রের আবাসস্থলে ইমাম লাইছ বিন সা'আদের কবরের নিকট তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর গায়েবী জানাযা মাক্কা, বায়তুল মাকদিস, আল খালীল, দামেস্ক, হালব সহ বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি রহম করুন।

উপসংহার ঃ

আল্লাহ তা'আলার অশেষ দয়ায় হাফিয ইবনু হাজার আল আসকালানীর জীবন ও কর্মের উপর লেখাটি সমাপ্ত করতে পেরে তাঁর শুকরিয়া আদায় করি। এখানে তাঁর ব্যক্তিগত, আধ্যাত্মিক ও 'ইলমী জীবন সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে আলোচনা পেশ করা হয়েছে। আশা করি এর মাধ্যমে ইবনু হাজারের মতো অনন্য ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ ধারণা পাওয়া যাবে। তিনি যে ইসলামের সোনালী ইতিহাসের উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন তা জানা যাবে।

ইবনু হাজারের জীবনীতে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, তিনি এ পৃথিবীতে নিজের স্বার্থ, ভোগ বিলাস ও অর্থ-বৈভবের জন্যে জীবন ধারন করেননি। তিনি তাঁর গোটা জীবনে সকাল-সন্ধ্যা সর্বক্ষণ 'ইলম অর্জনের জন্যে ব্যয় করেছেন। সকল বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে 'আলিমগণের নিকট দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে

বেড়িয়েছেন। তিনি সব সময় আল্লাহর দীন এবং মুসলিম উম্মাহর খেদমতে নিজের সময়কে কাজে লাগিয়েছেন। নিজে অধ্যয়ন করেছেন, ফাতওয়া দিয়েছেন, পাঠ দান করেছেন, বিচারকার্য পরিচালনা করেছেন এবং প্রচুর লেখালেখি ও গ্রন্থ রচনার কর্ম করেছেন। ফলে তিনি সমকালীন সময়ে বহু গ্রন্থ রচনা ও বিশ্বকোষ লেখক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। জগত জোড়া তাঁর এই খ্যাতি অদ্যাবধি অক্ষুণ্ন রয়েছে।

ইসলামের ইতিহাসে তিনি একজন অম্লান ব্যক্তিত্ব। মুসলিম জাতি তাঁর বিস্তৃত 'ইলম দ্বারা অতীতেও যেমন উপকৃত হয়েছেন বর্তমানেও হচ্ছেন। মহান রাব্বুল 'আলামীন তাঁকে উত্তম পুরস্কার দানে ধন্য করুন। তাঁর জ্ঞান থেকে সকলকে ফায়েদা হাসিলের তাওফীক দিন। পরিশেষে এ লেখাটি থেকে বাংলা ভাষাভাষি মানুষ যেন উপকৃত হয় এবং কর্মটি যেন দয়াময় আল্লাহ তা'আলা 'উপকারী জ্ঞান' হিসেবে কবুল করেন। আমীন!!!

وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা